প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জনদ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : প্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

পরবর্তী বর্ষে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ

সোদরাগ্রজ
অধ্যাপক সুধেন্দুরঞ্জন রায়
শ্রীচরণেষু

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

পাহাড়পুর-মন্দিরগাত্রের মৃৎফলকের আলোকচিত্র
আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে প্রাপ্ত

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, প্রতিদিনের অশনবসন বিলাসব্যসন চলনবলন আমোদউৎসব খেলাধুলা প্রভৃতি যে আমাদের মনন ও কল্পনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ এগুলি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এ-সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই। কিন্তু কোনো দেশকালবন্ধ নরনারীর মননকল্পনা ধ্যানধারণা চিন্তাভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয়, এবং ইহাদের মধ্যে শেষও নয়; জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, শীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাহাই; বরং এক হিসাবে চর্যা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে। চর্যার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। জীবনের এমন-কোনো দিক বা ক্ষেত্র নাই যেখানে মানুষ মননকল্পনা বা ধ্যানধারণালব্ধ গভীর সত্য ও সৌন্দর্যকে জীবনের আচরণে ফুটাইয়া তুলিতে না পারে। দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিতর দিয়া এই সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই তো সংস্কৃতির মৌলিক বিকাশ। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক দিকটায় এই আচরণ যতটুকু প্রকাশ পায় তাহার সবটুকুই সেইহেতু মানুষের মানস-সংস্কৃতিরই পরিচয়, এবং তাহার মৌলিক পরিচয়ও বটে।

যুক্তি

কিন্তু, প্রাচীন বাংলার এই দৈনন্দিন জীবনের চলমান জীবন্তরূপ ফুটাইয়া তুলিবার উপায় তথ্যগত ইতিহাস-রচনায় নাই। সেই চলমান মানবপ্রবাহের জীবন্তরূপ সমসাময়িক কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন নাই; অন্তত তেমন উপাদান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। তবু, তথ্যগত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক সাহিত্যরচয়িতারা সেদিকে কিছুকিছু সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বেণের মেয়ে সে-চেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু ঔপন্যাসিকের যে সুবিধা আছে, ঐতিহাসিকের তাহা নাই। কাজেই সে-চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। দৈনন্দিন জীবনচর্যার যেসব দিক ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ বর্তমান, শুধু সেইসব দিক সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করিতেছি। কালক্রমানুযায়ী সবিস্তারে বলিবার মত যথেষ্ট উপাদন আমাদের নাই; আহারবিহার বসনভূষণ খেলাধুলা আমোদ-উৎসব প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুকিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য শুধু বর্তমান। বিশেষভাবে এসব সংবাদ বহন করিবার জন্য কোনো গ্রন্থ সমসাময়িক কালে কেহ রচনা করেন নাই; অন্তত

এযাবৎ আমরা জানি না। এমন কাব্য বা কাহিনীও কিছু নাই যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুসংবন্ধ এবং সমগ্র পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। স্পষ্টতই, যেসব তথ্য আমরা পাইতেছি তাহা সমস্তই প্রায় পরোক্ষ, অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গের আশ্রয়ে যতটুকু উল্লিখিত ততটুকুই।

উপাদান

আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অস্ট্রিক ও দ্রবিড় ভাষাভাষী আদি কৌমসমাজের মধ্যে। সেইহেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দুই ভাষার এমনসব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে যেসব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনো-না-কোনো রূপে বর্তমান। এই হিসাবে এই শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও কিছু পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়, কিন্তু দুই-একটি বিষয়ে ছাড়া এইসব উপাদান কতটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থেও কিছুকিছু সংবাদ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; শেষোক্ত গ্রন্থটির সংবাদ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর, বিশেষভাবে বিলাসব্যসন ও কামচর্চা সম্বন্ধে, এবং বাংলার নাগরসভ্যতার প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনতথ্য এই গ্রন্থেই জানা যায়। এই দুইটি গ্রন্থ ছাড়া গুপ্তপূর্ব ও গুপ্তপর্বের বাংলার দৈনন্দিন জীবনের কোনো খবর আর কোথাও দেখিতেছি না।

গুপ্তপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য লিপিমালায় আমাদের আহার্য ও পরিধেয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে সাংসারিক জীবনের মান, সাংসারিক আদর্শ সম্বন্ধে টুকরা-টুকরা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত সংবাদ একেবারে দুর্লভ নয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবীর মূর্তিগুলিতে এবং পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে, বিশেষভাবে শেষোক্ত উপাদানসমূহে। দেবদেবীর মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই প্রতিমা-লক্ষণশাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত, সেইহেতু দেবদেবীদের বেশভূষা অলংকরণ দেহসজ্জা প্রভৃতিতে জীবনের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর তাহা কতকটা আদর্শগত ভাবমূলক ও প্রথাবদ্ধ মননকল্পনাদ্বারা রঞ্জিত প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পাহাড়-পুরের অথবা ময়নামতীর বিহার-মন্দির-গাত্রের অগণিত পোড়ামাটির ফলকগুলি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এই ফলকগুলিতে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাহার অকৃত্রিম সারল্য ও বস্তুময়তায় প্রতিফলিত; যেসব দিক সম্বন্ধে অন্যত্র কোনো সংবাদই প্রায় পাওয়া যায় না, লোকায়ত জীবনের সেসব দিকের নানা ছোটবড় তথ্য একমাত্র ইহাদের মধ্যেই দীপ্যমান। ফলকগুলির লোকায়ত শিল্পই সমসাময়িক লোকায়ত জীবনের ইঙ্গিত আমাদের দুয়ারে বহন করিয়া আনিয়াছে।

গ্রাম্য কৃষিজীবী সমাজের জীবনযাত্রার এমন সুস্পষ্ট ছবি আর কোথাও পাইবার উপায় নাই।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কিছুকিছু খবর বাংলার সুদীর্ঘ লিপিমালায়ও পাওয়া যায়। আহার-বিহার বসনভূষণ এবং গ্রাম- ও নগর- জীবন সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন তথ্য ইহাদের মধ্য হইতে আহরণ করা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু সেসব তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা কবি-কল্পনায়, নানা আলংকারিক অত্যুক্তিতে আচ্ছন্ন এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বহু অভ্যস্ত এবং সুপরিচিত রীতিপালন মাত্র, হয়তো যথার্থ বাস্তবজীবনের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ শিথিল, অথবা একেবারেই নাই। বসনভূষণ এবং সাধারণ সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা-প্রমাণ হইতেও আহরণ করা সম্ভব, কিন্তু সেসব তথ্য দৈনন্দিন ব্যবহারিক সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে কতটা প্রযোজ্য নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন।

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশসাহিত্যে। বাংলার সুবিস্তৃত স্মৃতিসাহিত্য, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, চর্যাগীতিমালা, দোহাকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত-ধৃত কিছুকিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক, প্রাকৃতপৈঙ্গলের কিছুকিছু শ্লোক, রামচরিত ও পবনদূতের মত কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের নানা তথ্য নানা উপলক্ষে ধরা পড়িয়াছে। কোনো সুসংবদ্ধ নিয়মিত বিবরণ কিছু নাই, কোনো বিশেষ দিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ চিত্রও নাই; তবু এইসব গ্রন্থের ইতস্তত উল্লিখিত তথ্যাদি একত্র করিলে মোটামুটি একটা ছবি ধরিতে পারা হয়তো খুব কঠিন নয়। সদ্যোক্ত সমস্ত গ্রন্থেরই দেশকাল মোটামুটি সুনির্ধারিত, অর্থাৎ ইহাদের অধিকাংশই বাংলাদেশে, এবং দশম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার বাঙালিত্ব সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নয়, তবে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার বাঙালিত্বের যেসব যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে নৈষধচরিতের বিবরণ বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। বিবাহ ও আহারবিহার সম্বন্ধে কিছুকিছু রীতি-নিয়ম, কোনো-কোনো তথ্য যেন বাংলাদেশ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অন্যত্র এসবের প্রচলন থাকিলেও শ্রীহর্ষ যেভাবে বর্ণনা দিতেছেন তাহাতে তো মনে হয়, তিনি বাঙালি হউন বা না হউন, এমন দেশখণ্ডের কথাই তিনি বলিতেছেন যেখানে এইসব রীতি আচার অভ্যাস ও সংস্কারের বহুল প্রচার বিদ্যমান, এবং সেই দেশখণ্ড হইতেছে বাংলাদেশ।

মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত বাংলাসাহিত্যে বাঙালির আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে রুচি ও রসনার যে সূক্ষ্ম বোধ

সুস্পষ্ট, রন্ধনকলার যে সূক্ষ্ম ও জটিল পরিচয় বিদ্যমান, আদিপর্বের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে-পরিচয় ধরা পড়ে নাই। এ-পর্বে জীবনের এই দিকটায় বাঙালির বুদ্ধি ও কল্পনা প্রসারিত হয় নাই, প্রমাণের অভাবে সেকথা জোর করিয়া বলা যায় না, তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুপস্থিত, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। সমস্ত সংবাদই পরোক্ষ এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

আহারবিহার

ইতিহাসের উষাকাল হইতেই ধান্য যে-দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু, সে-দেশে প্রধান খাদ্যই হইবে ভাত, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ভাত-ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। উচ্চকোটির লোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত; এবং 'হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী', ইহাই বাঙালি-জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ। ভাত রাঁধার প্রক্রিয়ার তারতম্য তো ছিলই, কিন্তু তাহার সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই বলিলেই চলে। উচ্চকোটির বিবাহভোজে যে-অন্ন পরিবেশন করা হইত সে-অন্নের কিছু বিবরণ নৈষধচরিতে দময়ন্তীর বিবাহভোজের বর্ণনায় পাওয়া যায়। গরম ধূমায়িত ভাত ঘৃতসহযোগে ভক্ষণ করাটাই ছিল বোধ হয় সাধারণ রীতি। প্রাকৃতপৈঙ্গল-গ্রন্থেও (চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি?) প্রাকৃত বাঙালির আহার্য দেখিতেছি কলাপাতায় : 'ওগ্‌গরা ভত্তা গাইক ঘিত্তা', গো-ঘৃতসহকারে সফেন গরম ভাত। নৈষধচরিতের বর্ণনা বিস্তৃততর : পরিবেশিত অন্ন হইতে ধূম উঠিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি কণা অভগ্ন, একটি হইতে আর-একটি বিচ্ছিন্ন (ঝর্‌ঝরে ভাত), সে-অন্ন সুসিদ্ধ সুস্বাদু ও শুভ্রবর্ণ, সরু এবং সৌরভময় (১৬।৬৮)। দুগ্ধ ও অন্নপক্ক পায়সও উচ্চকোটির লোকদের এবং সামাজিক ভোজে অন্যতম প্রিয় ভক্ষ্য ছিল (১৬।৭০)।

প্রাকৃত বাঙালির খাদ্য

ভাত সাধারণত খাওয়া হইত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে। দরিদ্র এবং গ্রাম্য লোকদের প্রধান উপাদানই ছিল বোধ হয় শাক ও অন্যান্য সবজি তরকারি। ডাল খাওয়ার কোনো উল্লেখই কিন্তু কোথাও দেখিতেছি না। উৎপন্ন দ্রব্যাদির সুদীর্ঘ তালিকায়ও ডালের বা কোনো কলাইর উল্লেখ কোথাও নাই। নানা শাকের মধ্যে নালিতা(পাট)শাকের উল্লেখ প্রাকৃতপৈঙ্গলে দেখিতেছি। বস্তুত, এই গ্রন্থের প্রাকৃত বাঙালির খাদ্য-তালিকাটি উল্লেখযোগ্য :

> ওগ্‌গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা
> মৌইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা(ই) পুনবন্তা।

কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতাশাক যে-স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করিতে পারেন তাঁহার স্বামী পুণ্যবান, এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি। কিন্তু সামাজিক ভোজে, বিশেষত বিবাহভোজে, বরযাত্রীরা শাক-সবজির তরকারি পছন্দ করিতেন না।

বিবাহভোজ

দময়ন্তীর বিবাহভোজে সবুজবর্ণ পাত্রে ভাত-তরকারি পরিবেশন করা হইয়াছিল। বরযাত্রীরা মনে করিলেন বুঝি-বা শাকান্ন পরিবেশন করা হইয়াছে; একটু বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করিলেন দেখিয়া কন্যাপক্ষীয়েরা বলিলেন, আপনাদের শাক পরিবেশন করা হয় নাই, পাত্রটির বর্ণ সবুজ বলিয়াই অন্নব্যঞ্জন সবুজ দেখাইতেছে। এই বিবাহভোজে যেসব ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যাইতেছে, ব্যঞ্জন তরকারি প্রভৃতির বাহুল্য সেই যুগেও উচ্চকোটির বাঙালি সমাজে যথেষ্টই ছিল, এবং এত বেশি আয়োজন হইত যে, লোকেরা সব খাইয়া, এমনকি গণনাও করিয়া, উঠিতে পারিত না। এই ধরনের বৃহৎ ভোজে সামাজিক অপচয়ের কথা ই-ৎসিঙও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কবি শ্রীহর্ষের কালে এবং আজও দেখিতেছি, বাংলাদেশে তাহা অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। যেসব ব্যঞ্জনাদি এই বিবাহভোজে পরিবেশিত হইয়াছিল তাহা তালিকাগত করা যাইতে পারে; দই ও রাইসরিষার প্রস্তুত শ্বেতবর্ণ কিন্তু বেশ ঝালযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন (যাহা খাইতে খাইতে লোকদের মাথা ঝাঁকিতে এবং তালু চাপড়াইতে হইয়াছিল); হরিণ ছাগ এবং পক্ষী মাংসের নানা রকমের ব্যঞ্জন; মাংসের নয় কিন্তু দৃশ্যত মাংসোপম বিবিধ উপাদানযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন; মাছের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য আরো নানা প্রকারের সুগন্ধি ও প্রচুর মসলাযুক্ত ব্যঞ্জনাদি; নানাপ্রকারের সুমিষ্ট পিষ্টক এবং দই ইত্যাদি। পানীয় পরিবেশিত হইয়াছিল কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জল। ভোজের পর দেওয়া হইয়াছিল নানা মসলাযুক্ত পানের খিলি। অবান্তর হইলেও একটি অনুমানগত তথ্যের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে লোকায়ত স্তরে পান পরিবেশনের রীতি হইতেছে পান সুপারি এবং অন্যান্য মসলা পৃথক পৃথক ভাবে সাজাইয়া দেওয়া। পূজা-পার্বণেও তাহাই প্রচলিত রীতি; আদিবাসী কৌমসমাজের রীতিও তাহাই। পান খিলি করিয়া পরিবেশন করা বোধ হয় পরবর্তী আর্য-ভারতীয় রীতি এবং উচ্চকোটি লোকস্তরে ক্রমশ সেই রীতিই প্রবর্তিত হয়। বৌদ্ধ গান ও দোহায় দেখিতেছি পানের সঙ্গে মসলা হিসাবে কর্পূর ব্যবহার করা হইত।

দই পায়স ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানাপ্রকারের খাদ্যের উল্লেখ একাধিক ক্ষেত্রে পাইতেছি। এগুলি চিরকালই বাঙালির প্রিয় খাদ্য। ভবদেবভট্টের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-

গ্রন্থে নানাপ্রকারের দুগ্ধপান সম্বন্ধে কিছুকিছু বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু তাহা সমস্তই স্বাস্থ্যগত কারণে।

মৎস্য ও মাংস আহার

মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় ছিল, বিশেষভাবে শবর পুলিন্দ প্রভৃতি শিকারজীবী লোকদের মধ্যে এবং সমাজের অভিজাত স্তরে। ছাগমাংসও বহুল প্রচলিত ছিল সমাজের সকল স্তরেই। কোনো-কোনো প্রান্তে ও লোকস্তরে, বিশেষভাবে আদিবাসী কোমে, বোধ হয় শুক্না মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভবদেবভট্ট কোনো কারণেই এবং কোনো অবস্থাতেই শুক্না মাংস খাওয়া অনুমোদন করেন নাই, বরং নিষিদ্ধই বলিয়াছেন। কিন্তু মাছই হোক আর মাংসই হোক, অথবা নিরামিষই হোক, বাঙালির রান্নার প্রক্রিয়া যে জটিল এবং নানা উপাদানবহুল ছিল, তাহা নৈষধচরিতের ভোজের বিবরণেই সুস্পষ্ট।

বারিবহুল, নদনদী-খালবিলবহুল, প্রশান্ত-সভ্যতাপ্রভাবিত এবং আদি-অস্ট্রেলীয়মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তুরূপে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের আহার্যতালিকার দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়, বাংলাদেশ এই হিসাবে কোন্ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সর্বত্রই এই তালিকায় ভাত ও মাছই প্রধান খাদ্যবস্তু। বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আজও দেখে না; অবজ্ঞার দৃষ্টিটাই বরং সুস্পষ্ট। মাংসের প্রতিও বাঙালির বিরাগ কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু আর্য-ভারতে ছিল; বিশেষভাবে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতেই খাদ্যের জন্য প্রাণীহত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে তো বটেই, একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশ দানা বাঁধিতেছিল এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশ নিরামিষ আহার্যের প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল। বাংলাদেশেও এই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু, চিরাচরিত এবং বহু অভ্যস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তাহা যথেষ্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই। বাংলার অন্যতম প্রথম ও প্রধান স্মৃতিকার ভট্টভবদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়া বাঙালির এই অভ্যাস সমর্থন করিয়াছেন। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস-ছাগলেয় প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকারদের মতামত উদ্ধার করিয়া ভবদেব বলিতেছেন, ইঁহাদের নিষেধবাক্য তো শুধু চতুর্দশী তিথি বা এই ধরনের বিশেষ-বিশেষ বার বা তিথি উপলক্ষে প্রযোজ্য, কাজেই মাছ বা মাংস খাওয়ায় কোনো দোষ স্পর্শে না। বস্তুত মাংস ও মৎস্য আহার বাংলাদেশে এত সুপ্রচলিত ও গভীরাভ্যস্ত যে, এই সমর্থন ছাড়া ভবদেবের আর কোনো উপায় ছিল না। বাংলার অন্যতম স্মৃতিকার শ্রীনাথাচার্যও তাহাই করিয়াছেন; বিষ্ণুপুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কয়েকটি

পর্বদিবস ছাড়া আর কোনো দিনেই মৎস্য বা মাংস আহার কিছু গর্হিত কাজ নয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে রোহিত, শফর (পুঁটি বা শফরী মাছ), সকুল (সোল) এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুক্ত অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়া জীমূতবাহন ইল্লিস(ইলিস বা ইল্‌সা)মাছের তৈলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। মনে হয়, আজিকার দিনের মত প্রাচীনকালেও ইলিস মাছ বাঙালির অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল এবং ইলিসের তৈল নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। সব মাছ কিন্তু ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য ছিল না; যেসব মাছ গর্তে কাদায় বাস করে, যাহাদের মুখ ও মাথা সাপের মত (যেমন বানমাছ), কদাকৃতি যাহাদের চেহারা, যাহাদের আঁশ নাই সেসব মাছ ব্রাহ্মণের পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পচা ও শুক্‌না মাছ খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থের লেখক সর্বানন্দ বলিতেছেন, বঙ্গালদেশের লোকেরা সিদ্ধলী বা শুক্‌না মাছ খাইতে ভালোবাসিত (যত্র বঙ্গালবচ্চারণাং প্রীতিঃ)। এখনও তো তাহাই। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস-বক, হাঁস, দাত্যূহ পক্ষী, উট, গোরু, শূকর প্রভৃতির মাংস একেবারেই ছিল অভক্ষ্য, অন্তত ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত সমাজে। তবে, সন্দেহ নাই, নিম্নতর সমাজস্তরে এবং আদিবাসী কৌমের লোকদের মধ্যে আজিকার মতই শামুক কাঁকড়া মোরগ প্রভৃতির মাংস, নানাপ্রকারের আঁশছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি বানমাছ, গর্ত-কাদাবাসী নানাপ্রকারের অকুলীন মৎস্য, নানাপ্রকারের পক্ষীমাংস সমস্তই ভক্ষ্য ছিল। পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে গোধা শশক সজারু এবং কচ্ছপ খাওয়ার খুব বাধানিষেধ কাহারো পক্ষে কিছু ছিল না, একথা ভবদেব নিজেই বলিতেছেন তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-গ্রন্থে। বাঙালির মৎস্যপ্রীতির পরিচয় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে কিছুকিছু পাওয়া যায়; মাছ-কোটা এবং ঝুড়িতে ভরিয়া মাছ হাটে লইয়া যাওয়ার দু'টি অতিবাস্তব চিত্র কয়েকটি ফলকেই উৎকীর্ণ। শবর পুরুষ হরিণ শিকার করিয়া কাঁধে ফেলিয়া বাড়ি লইয়া যাইতেছে সে-চিত্রও বিদ্যমান। শবর পুলিন্দ নিষাদ জাতীয় ব্যাধদের প্রধান বৃত্তিই তো ছিল হরিণ ও অন্যান্য পশুপক্ষী শিকার। হরিণশিকারের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে একাধিক চর্যাগীতে। একটি গীতে চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের যে বর্ণনা আছে অবান্তর হইলেও তাহা উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা কঠিন।

হরিণশিকার ও হরিণমাংস আহার

তেন ন ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় না জাণী॥
হরিণী বোলঅ সুন হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো॥

তরংগতে হরিণার খুর ন দাসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ন পইসই॥

(ভয়ে) হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জল খায় না; হরিণ জানে না হরিণীর ঠিকানা। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন হরিণ, এ-বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তীরগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না; ভুসুকু বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে না।

জালের সাহায্যেও হরিণ ধরা হইত, এই ধরনের ইঙ্গিত আছে ভুসুকুরই আর-একটি গীতিতে। তরঙ্গসংকুল মাঝনদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিবার ইঙ্গিতও আছে একটি চর্যাগীতি। কাহ্নপাদ বলিতেছেন—

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ॥
পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুয়াল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মায়াজাল॥

তরকারি

যেসব উদ্ভিদ-তরকারি আজও আমরা ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই, যেমন বেগুন লাউ কুকড়া ঝিঙে কাঁকরুল কচু (কন্দ) প্রভৃতি, আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এসব তরকারি বাঙালি খুব সুপ্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে এই অনুমান অনৈতিহাসিক নয়। পরবর্তীকালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পর্তুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানা সূত্রে নানা তরকারি, যেমন আলু, আমাদের খাদ্যের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আদিপর্বে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না। নানাপ্রকারের শাক খাওয়ার অভ্যাসও বাঙালির সুপ্রাচীন।

ফল

ফলের মধ্যে কলা তাল আম কাঁঠাল নারিকেল ও ইক্ষুর উল্লেখই পাইতেছি বারবার। আম ও কাঁঠালের উল্লেখ তো লিপিমালায় সুপ্রচুর। কলা আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকদের দান; প্রাচীন বাংলার চিত্রে ও ভাস্কর্যে কদলীভারাবনত কলাগাছের বাস্তব চিত্র সুপ্রচুর। পূজা বিবাহ মঙ্গলযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলা-গাছের ব্যবহার সমসাময়িক সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্ষুর রস আজিকার মত তখনও পানীয় হিসাবে সমাদৃত ছিল; ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া একপ্রকার গুড় (এবং বোধ হয় শর্করাখণ্ড জাতীয় একপ্রকার 'খণ্ড'চিনিও) প্রস্তুত হইত। হেমন্তে নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত বাংলার গ্রামের বর্ণনা সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে দীপ্যমান। তেঁতুলের উল্লেখ আছে একটি চর্যাগীতিতে।

কালবিবেক ও কৃত্যতত্ত্বার্ণব-গ্রন্থে আশ্বিনমাসে কোজাগরপূর্ণিমারাত্রে আত্মীয়-বান্ধবদের চিপিটক বা চিড়া এবং নারিকেল প্রস্তুত নানাপ্রকারের সন্দেশে পরিতৃপ্ত করিতে হইত, এবং সমস্ত রাত বিনিদ্র কাটিত পাশাখেলায়। খই-মুড়ি (লাজ) খাওয়ার রীতিও বোধ হয় তখন হইতেই প্রচলিত ছিল; খই বা লাজ যে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ বিবাহোৎসবে সুপ্রচুর খই-বর্ষণের বর্ণনায় এবং লাজহোমের অনুষ্ঠানে।

পানীয়

দুধ, নারিকেলের জল, ইক্ষুরস, তালরস ছাড়া মদ্যজাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল। গুড় হইতে প্রস্তুত সর্বপ্রকার গৌড়ীয় মদ্যের খ্যাতি ছিল সর্বভারতব্যাপী। ভাত গম গুড় মধু ইক্ষু তালরস প্রভৃতি গাঁজাইয়া নানাপ্রকারের মদ্য প্রস্তুত হইত। ভবদেবভট্ট তাঁহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকার মদ্য-পানীয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সঙ্গেসঙ্গে দ্বিজ ও দ্বিজেতর সকলের পক্ষেই মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাঁহার এই স্মৃতি-নির্দেশ কতটা মানিয়া চলিত, বলা কঠিন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কালে স্বর্ণ মদ্য রক্ত মৎস্য ও মাংস উপাচারে এবং নরবলি সহকারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শিবপূজা নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, শিবপূজা পক্ষে এই নিষেধ প্রয়োজন হইলেও শক্তিপূজায় এইসব উপাচার ও নরবলি নিষিদ্ধ ছিল না, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাল ছাড়া অন্য সময়ে কোনো পূজায়ই তেমন নিষেধ কিছু ছিল না। চর্যাগীতির একাধিক গীতিতে যেভাবে শৌণ্ডিকালয় বা শুঁড়িখানার উল্লেখ পাইতেছি, মনে হয়, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ভিতর মদ্যপান খুব গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। শৌণ্ডিকালয়ে বসিয়া শৌণ্ডিক বা শুঁড়ির স্ত্রী মদ্য বিক্রয় করিতেন, এবং ক্রেতারা সেইখানে বসিয়াই তাহা পান করিতেন। শুঁড়িখানার দরজায় বোধ হয় একটা-কিছু চিহ্ন আঁকা থাকিত, এবং মদ্যাভিলাষীরা সেই চিহ্ন দেখিয়াই গন্তব্য স্থানটি চিনিয়া লইতেন। একজাতীয় গাছের সরু বাকল (অন্য মতে, শিকড়) শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া তাহা দ্বারা মদ চোলাই করা হইত। বেলের খোলা করিয়া মদ্যপানের উল্লেখ আছে সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে; চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, মদ্য ঢালা হইত ঘড়ায় ঘড়ায়। বিরুবাপাদ বলিতেছেন—

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅন বা কলঅ বারুণী বান্ধঅ॥...
দশমী দুআরত চিহ্ন দেখিয়া।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥

এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্ত বিরুআ থির করি চাল॥

এক শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধে (ঢোকে), সে চিকণ বাকল দ্বারা বারুণী (মদ্য) বাঁধে। শুঁড়ির ঘরের চিহ্ন (আছে) দুয়ারেই; সেই চিহ্ন দেখিয়া গ্রাহক নিজেই চলিয়া আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হইয়াছে; গ্রাহক যে ঘরে ঢুকিল তাহার আর সাড়াশব্দ কিছু নাই (মদের নেশায় এমনই বিভোর)। সরু নালে একটি ঘড়ায় মদ ঢালা হইতেছে—বিরুপা সাবধান করিতেছেন, সরু নল দিয়া চাল স্থির করিয়া বারুণী ঢাল।

প্রাচীন বাঙালি ডাল খাইত কি না

প্রাচীন বাঙালির খাদ্যতালিকায় ডালের উল্লেখ কোথাও দেখিতেছি না। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বাংলা আসাম ও ওড়িষ্যায় যত ডাল আজও ব্যবহৃত হয়—এ ব্যবহার ক্রমশ বাড়িতেছে সমাজের সকল স্তরেই—তাহার খুব স্বল্পাংশই এই তিন প্রদেশে জন্মায়। পূর্বেও তাহাই ছিল; বোধ হয় উৎপাদন আরও কম ছিল। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায়, প্রশান্তমহাসগরের দেশ ও দ্বীপগুলিতে আজও ডালের ব্যবহার অত্যন্ত কম, নাই বলিলেই চলে। সেইজন্য ডালের চাষও নাই। বাংলাদেশের কোনো-কোনো জেলায়, যেমন বরিশালে ও ফরিদপুরে, উচ্চকোটি লোকস্তরে বহু ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ ও আমিষ ব্যঞ্জনাদি খাওয়ার পর সর্বশেষে ডাল খাওয়ার রীতি প্রচলিত। আর, নিম্নকোটি স্তরে বাংলার সর্বত্রই আজও অনেকে ডাল ব্যবহারই করেন না; প্রাচীনকালে বোধ হয় একেবারেই করিতেন না। আর সুলভ মৎস্যভোজীর পক্ষে তাহার প্রয়োজনও ছিল কম। বস্তুত, ডালের চাষ ও ডাল খাওয়ার রীতিটা বোধ হয় আর্য-ভারতের দান, এবং তাহা মধ্যযুগে।

এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই মৎস্যভোজী বাঙালির আহার্য অবাঙালিদের রুচি ও রসনায় খুব শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিল না, আজও নয়। তীর্থংকর মহাবীর যখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে শিষ্যদল লইয়া পথহীন রাঢ় ও বজ্রভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তাঁহাদের অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সন্দেহ নাই যে, সেই আদিবাসী কৌমসমাজের মৎস্য ও শিকার-মাংস ভক্ষণ, সমসাময়িক সাধারণ বাঙালির উদ্ভিজ্জ-ব্যঞ্জনাদি, এবং তাহাদের আদিম রন্ধনপ্রণালী ভিন্‌প্রদেশী জৈন আচার্যদের নিরামিষ রুচি ও রসনায় অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। সে অশ্রদ্ধা আজও বিদ্যমান।

শিকার ও অন্যান্য শারীর-ক্রিয়া

রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত প্রভৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শিকার বা মৃগয়া। আর, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ শবর পুলিন্দ চণ্ডাল ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী



বিশ্রামরত দ্বারপাল



উদ্‌খল-বন্ধন



করতালবাদ্যরত পুরুষ



দম্পতি



হাটফেরত পিতাপুত্র



যোদ্ধা



বংশীবাদক



মৃদ্‌ভাণ্ডবাদ্যরত পুরুষ



পথিক



বাদ্যরত পুরুষ



ভিক্ষুক



শবর দম্পতি



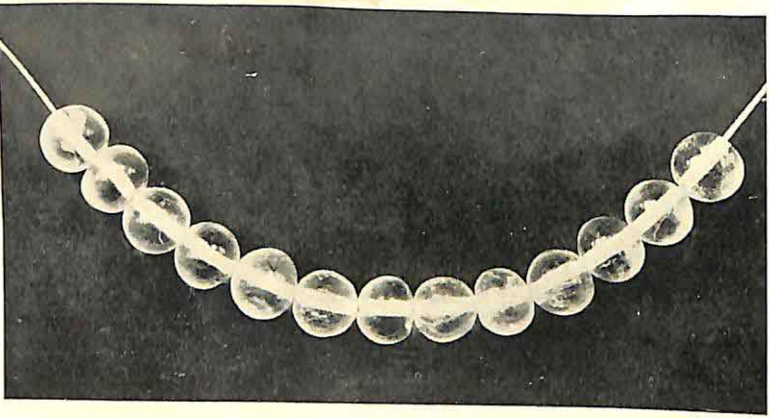
পতাকাবাহী সৈনিক



ধনুর্ধারী শবর-পুরুষ ও ভীতত্রস্ত পুত্র



শরাহত হরিণ





মালা

কোমদের শিকারই ছিল প্রধান উপজীব্য ও বিহার দুইই। ইঁহাদের কিছুকিছু শিকারচিত্র পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে দেখা যায়। এই ফলকগুলিতেই দেখিতেছি, কুস্তী বা মল্লযুদ্ধ এবং নানাপ্রকারের দুঃসাধ্য শারীর-ক্রিয়া ছিল নিম্নকোটির লোকদের অন্যতম বিহার। পবনদূতে নারীদের জলক্রীড়া এবং উদ্যান-রচনার উল্লেখ আছে; এই দুইটিই বোধ হয় ছিল তাঁহাদের প্রধান শারীর-ক্রিয়া।

গৃহক্রীড়া

দ্যূত বা পাশাখেলা এবং দাবাখেলার প্রচলন ছিল খুব বেশি। পাশাখেলাটা তো বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। দাবাখেলার প্রচলন যে বাংলাদেশে কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন; তবে চর্যাগীতিতে 'ঠাকুর' (অর্থাৎ 'রাজা') 'মন্ত্রী' 'গজবর' এবং 'বড়ে', এই চারি গুটি, খেলার 'দান' এবং ছকের চৌষট্টি কোঠার বা ঘরের উল্লেখ এমন সহজভাবে পাইতেছি যে মনে হয়, দশম-একাদশ শতকের আগেই এই খেলা বাংলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। কাহ্নপাদ বলিতেছেন—

করুণা পিহাড়ি খেলহু নঅবল।
সদগুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন নিঅড় জিনউর॥
পহিলেঁ তোড়িয়া বড়িআ মারিউ।
গহবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্ন অম্হে ভাল দান দেহুঁ।
চউষট্‌ঠি কোঠা গুণিয়া লেহুঁ॥

করুণার পিড়িতে নববল (দাবা) খেলি, সদগুরুবোধে ভববল জিতিলাম। দুই নষ্ট হইল, ঠাকুরকে (রাজাকে) দিও না; উপকারীর উপদেশে কাহ্নর নিকটে জিনপুর। প্রথমে বড়িয়া তুড়িয়া মারিলাম (অর্থাৎ, প্রথমেই হইল বড়ের চাল); তারপর গজবল (হাতি) তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম। মন্ত্রীকে দিয়া ঠাকুরকে (রাজাকে) প্রতিনিবৃত্ত করিলাম (ঠেকাইলাম); অবশ করিয়া ভববল জিতিলাম। কাহ্ন বলে, দান আমি ভালই দিই, চৌষট্টি কোঠা গুনিয়া লই।

নিম্নকোটি স্তরে এবং নারীদের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানাপ্রকার খেলা, যথা, ঘুঁটি বা ঘুঁটিখেলা বাঘবন্দী ষোলঘর দশপঁচিশ আড়াইঘর প্রভৃতি তখন হইতেই সুপ্রচলিত ছিল, এমন অনুমানে কিছুমাত্র বাধা নাই। সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের

অনুসন্ধানে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে, এইসমস্ত খেলা সমগ্র পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরবন্ধ দেশ ও দ্বীপগুলির সুপ্রাচীন কৌমসমাজের একেবারে মৌলিক গৃহক্রীড়া।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থ হইতে জানা যায়, 'অডঢ' বা 'আঢ' অর্থাৎ বাজি রাখিয়া তখনকার দিনের লোকেরা জুয়া খেলিতেও অভ্যস্ত ছিল। লোকেরা বাজি রাখিয়া ভেড়া ও মুরগীর লড়াই খেলিত ও খেলাইত।

সমতটেশ্বর শ্রীধারণ-রাতের কৈলান-লিপিতে বলা হইয়াছে, সতত হস্তী ও অশ্বক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকার ফলে শ্রীধারণের দেহ ছিল পেশীসমৃদ্ধ এবং সুদর্শন (গজতুরগ-সতত-পীড়ন-ক্রমোচিতশ্রম বলিততনুবিভাগ-রম্যদর্শন)। রাজ-পরিবারে এবং অভিজাতবর্গের পুরুষদের মধ্যে হস্তী ও অশ্বক্রীড়া সুপ্রচলিত ছিল, সন্দেহ নাই।

নৃত্যগীতবাদ্য ও অভিনয়

নৃত্যগীতবাদ্যের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ সুপ্রচুর। রামচরিত পবনদূত প্রভৃতি কাব্যে, নানা লিপিতে, সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রকীর্ণ শ্লোকে, চর্যাগীতি ও দোহাকোষের নানা জায়গায় নানা সূত্রে নৃত্যগীতবাদ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, উচ্চ ও নিম্নকোটি উভয় স্তরেই এই দুই বিদ্যা ও ব্যসনের সমাদর ছিল যথেষ্ট। বাররামা ও দেববাসীদের সকলকেই নৃত্যগীতবাদ্যপটীয়সী হইতে হইত। তাঁহারা যে নানা কলানিপুণা ছিলেন, একথার ইঙ্গিত সেন-লিপিতে এবং পবন-দূতেও আছে। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে দেখিতেছি, পুণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরে যে নৃত্যগীত হইত তাহা ভরতের নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী, এবং এই নৃত্যগীতমুগ্ধ জয়ন্ত স্বয়ং ভরতানুমোদিত নৃত্যগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং অসংখ্য ধাতব ও প্রস্তরমূর্তিতে নানা ভঙ্গিতে নৃত্যপর পুরুষ ও নারীর প্রতিকৃতি সুপ্রচুর। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত উভয় পুরাণেই নট পৃথক বর্ণহিসাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন, সমাজের নিম্নতর স্তরে। এখনও বাঙালিসমাজের নিম্নস্তরে এক ধরনের গায়কগায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়, গান গাহিয়া এবং নাচিয়াই যাঁহারা জীবিকানির্বাহ করেন; ইঁহারাই বোধ হয় উপরোক্ত পুরাণ দুইটির নটবর্ণ। কিন্তু উচ্চকোটির কেহ কেহও বোধ হয় নটনটীর বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। জয়দেব-গৃহিণী পদ্মাবতী প্রাক্‌বিবাহ-জীবনে কুশলী নটী ছিলেন এবং সংগীতে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে, কোনো-কোনো প্রস্তরচিত্রে নানাপ্রকারের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে; যেমন, কাঁশর করতাল ঢাক বীণা বাঁশি মৃদঙ্গ মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি। রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীতে বিশেষ এক ধরনের মুরজ(মৃদঙ্গ)বাদ্য প্রচলিত ছিল; বাংলার অন্যত্র বোধ হয় অন্য প্রকারের মুরজের প্রচলন ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতের

একটি শ্লোকে আছে, তুম্বীবীণার উল্লেখ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাইতেছি চর্যাগীতিতে—কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত উভয়েরই, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের এবং বোধ হয় গীতাভিনয়েরও। নিম্নশ্রেণীর নটনটীদের কথা আগেই বলিয়াছি। চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, ডোম্বীরা সাধারণত খুব নৃত্যগীতপরায়ণা হইতেন—

এক সো পদ্ম চৌষঠী পাখুড়ী।
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।

একটি পদ্ম, তাহার চৌষট্টি পাপড়ী; তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোম্বী। লাউ-এর খোলা আর বাঁশের ডাঁট বা দণ্ডে তন্ত্রী (তার) লাগাইয়া বীণাজাতীয় এক প্রকার যন্ত্র ইঁহারা প্রস্তুত করিতেন, আর গান গাহিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অনহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তিধ্বনি বিলসই রুণা॥...
নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥

সূর্য লাউ-এ শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড—সব এক করিয়া দিল অবধূতী। ওলো সখি, হেরুক-বীণা বাজিতেছে; শোন্, তন্ত্রীধ্বনি কি সকরুণ বাজিতেছে। বজ্রাচার্য নাচিতেছে, দেবী গাহিতেছে—এইভাবে বুদ্ধনাটক সুসম্পন্ন হয়।

বুদ্ধনাটকের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার মত। নৃত্য এবং গীতের সাহায্যে এক ধরনের নাট্যাভিনয় বোধ হয় প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল, এবং এই নাচগানের ভিতর দিয়াই বোধ হয় কোনো বিশেষ ঘটনাকে (এই ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীকে?) রূপদান করা হইত।

অবান্তর হইলেও এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা চলে যে, নৃত্যগীতপরায়ণা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ডোম্বী ও অন্যান্য তথাকথিত নীচজাতীয়া রমণীদের সামাজিক নীতিবন্ধন কিছুটা চঞ্চল ও শিথিল হইত, এবং সেইহেতু তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চকোটির পুরুষদেরও মনোহরণে সমর্থ হইতেন। তাহা ছাড়া জাতি ও শ্রেণী-সংস্কারমুক্ত সহজযানী ও কাপালিকদের যোগের সঙ্গিনী হইতেও কোনো বাধা তাহাদের বা যোগীদের কাহারও হইত না—

কইসণি হালো ডোম্বী তোহেরী ভাভরী আলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী॥...

কেহো কেহো তোহেরে বিরূআ বোলই।
বিদূজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই॥
কাহ্নে গায় তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিনালী॥

হাঁলো ডোম্বী, কিরূপ (আশ্চর্য) তোর চাতুরী! তোর (এক) অন্তে কুলীন-জন, (আর) মধ্যে কাপালী! কেহ কেহ তোকে বলে বিরূপ (তাহাদের প্রতি), (কিন্তু) বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়ে না। কাহ্ন গায়, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর চেয়ে বেশি ছিনালী (আর) কেহ নাই।

লোকায়ত সমাজে এবং সামাজিক ও ধর্মগত উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে, নানা ক্রিয়াকর্মে নৃত্যগীতের প্রমাণ সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যে সুস্পষ্ট। চর্যাগীতির একটি গীতে সমসাময়িক বিবাহযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা আছে এবং সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। কাহ্নুপাদ বলিতেছেন—

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
মনপবন বেণি করণ্ডকশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বী বিবাহীআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণতু ধাম॥

ভব ও নির্বাণ হইল পটহ মাদল; মনপবন দুই করণ্ডক শালা। জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করিয়া কাহ্ন চলিল ডোম্বীকে বিবাহ করিতে। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম খাইলাম, কিন্তু যৌতুকে (লাভ) করিলাম অনুত্তরধাম (অর্থাৎ, নীচু জাতের ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জাত কুল গেল বটে, কিন্তু ভালো যৌতুক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ক্ষতি যেন সব পূরণ হইয়া গিয়াছে, এই ভাব)।

বিবাহযৌতুক

তখনকার দিনে বাংলাদেশে বিবাহব্যাপারে বরপক্ষ যৌতুক লাভ করিত, এবং যৌতুকের লোভে নীচকুল হইতে কন্যাগ্রহণেও খুব আপত্তি ছিল না, অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটিও এই গীতে বিদ্যমান।

যানবাহন — নৌযান

সাধারণ লোকেরা স্থলপথে পদব্রজে এবং জলপথে ভেলা বা ডিঙ্গা এবং নৌকাযোগেই যাতায়াত করিত। ভেলা, ডিঙ্গা-ডিঙ্গী-ডোঙ্গা, প্রত্যেকটি শব্দই

অস্ট্রিক ভাষার দান; এবং মনে হয়, আদিমতম কাল হইতেই ইহাদের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। নৌকার ব্যবহার, নৌবন্দর, নৌঘাট, নৌবাণিজ্য, নৌদণ্ডক প্রভৃতির কথা ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আগেই বলিয়াছি; কিন্তু নৌকার সঙ্গে বাঙালি-জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগের কথা ধরা পড়িয়াছে চর্যাগীতিতে। রূপকছলে নৌকা, নৌকার হাল, গুণ, কেড়ুয়াল, পুলিন্দা, খোল, চক্র বা চাকা, খুঁটি, কাছি, সেঁউতি, পাল প্রভৃতি এমন সহজভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে, মনে হয়, এই যানটির সঙ্গে বাঙালির হৃদয়ের একটি গভীর যোগ ছিল। নৌকায় খেয়া-পারাপারের ইঙ্গিতও আছে। পারের মাশুল আদায় হইত কড়িতে (কবড়ী) বা বোড়িতে। খেয়া-পারাপারের কাজ অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর নারীরাও করিতেন। চর্যাগীতির একটি গীতিতে দেখিতেছি, পাটনীর কাজটি করিতেছেন জনৈকা ডোম্বী—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।
তাহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পঅিপত্র জাইব পুনু জিন উরা॥
পাঞ্চ কেড়ুয়াল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কচ্ছী বান্ধী।
গঅণ খোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধী॥...
কবড়ী ন লেই বাড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কুলে কুলে বুলই॥

গঙ্গা আর যমুনার মাঝে বহিতেছে নৌকা; মাতঙ্গকন্যা ডোম্বী তাহাতে জলে ডুবিয়া ডুবিয়া লীলায় পার করিতেছে। বাহ গো ডোম্বী, বাহিয়া চল, পথেই দেরি হইয়া যাইতেছে; সদ্‌গুরু পাদপদ্মে যাইব জিনপুর। পাঁচটি দাঁড় পড়িতেছে পথে, পিঠে কাছি বাঁধ; সেঁউতিতে জল সেচ, জল যেন সন্ধিতে প্রবেশ না করিতে পারে। ... কড়িও লয় না, স্বেচ্ছায় করে পার; যাহারা রথে চড়িল, নৌকা বাওয়া জানিল না, তাহারা শুধু কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিল।

সহরপাদের একটি গীতে আছে—

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু-বঅণে ধর পতিবাল॥
চীঅ থির করি ধরহু রে নাই।
আন উপায়ে পার ন জাই॥
নৌবাহী নৌকা টানঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণেঁ॥

বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সর বি বোলিআ॥
কুল লই খর সোঁন্তে উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণে সমাঅ॥

কায় (হইতেছে) নৌকা, খাঁটি মন (হইল তাহার) দাঁড়; সদ্‌গুরু বচনে হাল ধর। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধর; অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকা টানে গুণে; সহজে গিয়া মিলিত হও, অন্য (পথে) যাইও না। পথে (আছে) ভয়, বলবান দস্যু; ভব উল্লোলে (তরঙ্গে) সবই টলমল। কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া যায়; সরহ বলে, গগনে গিয়া প্রবেশ করে। অন্যত্র কম্বলপাদ বলিতেছেন—

খুণ্টী উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥
মাঙ্গত চড়্হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাকি কেঁকি বাহবকে পারঅ॥

খুঁটি (গোঁজ) উপড়াইয়া কাছি খুলিয়া দাও; হে কামলি (পূর্ব-বাংলায় মাঝি প্রভৃতি দিনমজুরদের আজও বলে কাম্‌লা বা কামুলা), সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া নৌকা বাহিয়া চল। পথ চড়িয়া (মাঝনদীতে আসিয়া) চারিদিকে চাহিয়া দেখ; দাঁড় না থাকিলে কে বাহিতে পারে?

নদ-নদী-খাল-বিলের বাংলাদেশে নৌকা ও নদীকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের রূপ-রূপক গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়—

ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥

ভবনদী গভীর, গম্ভীর বেগে বহিয়া চলে; দুই তীরে কাদা, মাঝে ঠাঁই নাই।

এ-ছবি তো একান্তই বাংলার নদনদীগুলির—দুই তীর পলিমাটির কাদায় ভরা; আর নদীর গভীর গম্ভীর বেগ, সেও তো গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-লৌহিত্যেরই। সরহপাদের একটি গীতে আছে—

বাম দাহিন জো খাল-বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভইলা॥

(পথে) বামে দক্ষিণে অনেক খাল-বিখাল; সরহ বলেন, সোজা পথ ধরিয়া চল (অর্থাৎ, খাল-বিখালের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িও না, সোজা চলিয়া যাও)।

এই ছবিও তো একান্তই বাংলাদেশের। এত খাল-বিখালই বা আর কোথায়! শান্তিপাদের একটি গীতে আছে—

কূলে কূলে মা হোইরে মূঢ়া উজূবাট সংসারা।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা॥
মাআ মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এস অট মহাসিদ্ধি সিঝই উজূবাট জাঅন্তে॥
বামদাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুঝিঅ বাট জাইউ॥

হে মূঢ়, কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিও না; সংসারের (মাঝখানে রহিয়াছে) সহজ পথ। সম্মুখে পড়িয়া আছে যে সমুদ্র, তাহার অন্ত যদি না বুঝা যায়, থই যদি না পাওয়া যায়, সম্মুখে যদি কোনো নৌকা বা ভেলা দেখা না যায়, তবে অভিজ্ঞ পথিক যাঁহারা তাঁহাদের নিকট হইতে পথের দিশা জানিয়া লও। শূন্য প্রান্তরে যদি পথের ঠিকানা না মেলে, তবু ভ্রান্তির পথে আগাইয়া যাওয়া উচিত নয়। সোজা সহজ পথ ধরিয়া গেলেই মিলিবে অষ্টমহাসিদ্ধি। খেলা করিতে করিতে বাম ও দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া (মাঝপথে) চলিতে হইবে। এই সহজ পথে ঘাট-ঝোপ কিছু নাই, বাধাবিঘ্ন কিছু নাই; চোখ বুজিয়া এই পথে চলা যায়।

গোযান

স্থলপথে গ্রাম হইতে দূরে গ্রামান্তরে বা নগরে যাইবার লোকায়ত যান ছিল গো-রথ বা গোরুর গাড়ি। মহিষের গাড়ির উল্লেখ দেখিতেছি না; কিন্তু নৈষধ-চরিতের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বাঙালি প্রাচীন কালে মহিষের দধি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল।

হস্তী ও অশ্বযান

গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে দেখিতেছি, প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের রাজাদের চতুরশ্ববাহিত রথ ছিল। অশ্ববাহিত যান উচ্চকোটির লোকেরা ব্যবহার করিতেন, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন, যুদ্ধে গঙ্গারাষ্ট্রের সৈন্যবলের মধ্যে প্রধান বলই ছিল হস্তীবল। অসংখ্য লিপিতেও হস্তী-সৈন্যের উল্লেখ সুপ্রচুর। সুপ্রাচীন কাল হইতেই পূর্বভারতে হস্তী অন্যতম প্রধান বাহন বলিয়াও গণ্য হইত। এই পূর্ব-ভারতেই, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ও কামরূপে,

হাতি ধরা ও হাতির চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি বিশেষ শাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তো বলেন, হস্তী-আয়ুর্বেদ বাংলার অন্যতম প্রধান গৌরব। রাজ-রাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্তরা, বড় বড় ভূম্যধিকারীরা হাতিতে চড়িয়াও যাতায়াত করিতেন, সন্দেহ নাই। চর্যাগীতি ও দোহাকোষে হাতির রূপক আশ্রয় অনেকগুলি গীতে স্থান পাইয়াছে এবং রূপকগুলি এমন, মনে হয়, এই প্রাণীটির সঙ্গে বাঙালির প্রাণের গভীর পরিচয় ছিল। খেদা পাতিয়া আজিকার দিনে যেমন করিয়া হাতি ধরা হয় তখনও তেমন করিয়াই হাতি এবং হাতিশিশু (করভ) ধরা হইত। বন্য হাতি সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। চর্যাগীতিতে কাহ্নপাদের একটি গীত আছে—

এবং কার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বাহ্মণ তোড়িউ॥
কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা॥

কিন্তু বন্য হাতি কোনো বাধাবন্ধনই মানিত না, সমস্ত শিকল খুঁটি ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া পদ্মবনে গিয়া প্রবেশ করিত। পাগলা হাতির বর্ণনা মহীধরপাদের একটি গানেও আছে—

মাতেল চীঅ গএন্দা ধারই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই॥
পাপ পুণ্ণ বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠানা।
গঅন টাকলি লাগিরে চিত্ত পইঠি নিবানা॥

আমার মত্ত চিত্তগজেন্দ্র ধাবিত হইতেছে; নিরন্তর গগনে সকল কিছু ঘোলাইয়া যাইতেছে। পাপ ও পুণ্য উভয়েই শিকল ছিঁড়িয়া এবং সকল খাম্ভা মাড়াইয়া গগন-শিখরে গিয়া পেঁাছিয়া সে একেবারে শান্ত হইয়াছে।

উত্তর ও পূর্ব-বাংলার পার্বত্য নদীর তীরে হাতিরা ঘুরিয়া বেড়াইত যথেচ্ছভাবে। সহরপাদ বলিতেছেন—

মুক্কউ চিত্তগজেন্দ করু এথ বিঅপ্প ণ পুচ্ছ।
গঅন গিরী ণইজল পিএউ তিহঁ তড় বসউ সইচ্ছ॥

চিত্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত কর; এ-বিষয়ে আর কোনো বিকল্প জিজ্ঞাসা করিও না। গগনগিরির নদীজল সে পান করুক, তাহার তটে স্বইচ্ছায় সে বাস করুক।

হাতি ধরিবার আগে সারিগান গাহিয়া হাতির মনকে বশ করিতে হইত। বীণাপাদের একটি গানে আছে—

আলি কালি বেণি সারি মুনিআ।
গঅরব সমরস সান্ধি গুণি আ॥

গোরুর গাড়ির চেহারা এখনও যেরূপ প্রাচীন কালেও তাহাই ছিল; বাংলা ও ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রস্তর ও মৃৎফলকই তাহার প্রমাণ। বরযাত্রায়ও গোরুর গাড়ি ব্যবহার করা হইত, চর্যাগীতির একটি গীতে এইরূপ ইঙ্গিত আছে। পাহাড়পুরের একটি মৃৎফলকে সুসজ্জিত অশ্বের একটি চিত্র আছে; এই ধরনের সজ্জিত অশ্বে চড়িয়াই সংগতিসম্পন্ন লোকেরা যাতায়াত করিতেন।

পালকির ব্যবহারও ছিল বলিয়াই মনে হয়। কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে দেখিতেছি, একটু প্রচ্ছন্নভাবে হস্তীদন্তনির্মিত বাহদণ্ডযুক্ত পালকির উল্লেখ। বল্লালসেন নাকি তাঁহার শত্রুদের রাজলক্ষ্মীদিগকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন এই ধরনের পালকি চড়াইয়া।

ঘরবাড়ি

রামচরিত ও পবনদূতে রামাবতী ও বিজয়পুরের বর্ণনা এবং বাণগড় রামপাল মহাস্থান দেওপাড়া প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় সমৃদ্ধ নগরবাসীরা ইঁটকাঠের তৈরি ক্ষুদ্র বৃহৎ হর্মে বাস করিতেন; রাজপ্রাসাদও তৈরি হইত ইঁটকাঠেই। কিন্তু এইসব ভবনের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রামে ইঁটকাঠের বাড়ি বড়-একটা ছিল বলিয়া মনে হয় না; কোনো গ্রাম-বর্ণনাতেই সেরূপ কোনো উল্লেখ দেখিতেছি না। দরিদ্র নিম্নকোটির লোকেরা ত বটেই, এমনকি সম্পন্ন মহত্তর-কুটুম্ব-গৃহস্থরাও সাধারণত মাটি খড় বাঁশ কাঠ ইত্যাদির তৈরি বাড়িতে বাস করিতেন; মৃৎফলকের সাক্ষ্যে মনে হয়, চাল হইত খড়ের, বাঁশের চাঁচারি বুনিয়া তৈরি হইত বেড়া, আর খুঁটি হইত বাঁশের বা কাঠের। চর্যাগীতিতে বাঁশের চাঁচারি দিয়া বেড়া বাঁধিবার কথা আছে (চারিপাশে ছাইলা রে দিয়া চঞ্চালী)। মাটির দেয়ালও ছিল; রাঢ়াঞ্চলে ও উত্তর-বঙ্গে মাটির দেয়াল, পূর্বাঞ্চলে চাঁচারির বেড়া। প্রস্তর ও মৃৎফলকের চিত্র এবং পাণ্ডুলিপি-চিত্র হইতে মনে হয়, আজিকার মতন তখনও বাঁশের বা কাঠের খুঁটির উপর ধনুকাকৃতি বা দুই-তিন স্তরে পিরামিডাকৃতির চাল বা ছাউনি তৈরি হইত। একান্ত গরীব গৃহস্থ ও সমাজ-শ্রমিকেরা কুঁড়েঘরে বাস করিতেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে এই ধরনের কুঁড়েঘরের একটি বাস্তব বর্ণনা আছে; 'প্রচুর পয়সি' প্রাচ্য এবং বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশে বর্ষায় দরিদ্র গৃহস্থের জীর্ণগৃহের দুর্দশার এমন বস্তুনির্ভর অথচ কাব্যময় বর্ণনা বিরল। কবি যার ছবি আঁকিয়াছেন—

চলৎ কাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম।
গণ্ডুপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

নদ-নদী-খাল-বিখালের বাংলাদেশে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়া যাইতে আজিকার মত তখনও সাঁকোর প্রয়োজন ছিলই; এবং এই কারণেই বাঁশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সঙ্গে বাঙালির পরিচয়ও ছিল প্রাচীনকাল হইতেই। চর্যাগীতির একটি গীতে বলা হইয়াছে, পারগামী লোক যাহাতে নির্ভয়ে পারাপার করিতে পারে সেজন্য চাটিলপাদ বেশ একটি দৃঢ় সাঁকো প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বড় গাছ চিরিয়া সাঁকোর পাট জোড়া দেওয়া হইত এবং টাঙ্গিদ্বারা ইহাকে শক্ত করা হইত—

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামী লোঅ নিভর তরই॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ॥

তৈজসপত্র

গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে নানা জিনিসের উল্লেখ চর্যাগীতি রামচরিত পবনদূত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে, এবং তাহাদের প্রতিকৃতি প্রস্তর ও মৃৎফলকে দেখিতেছি। সমৃদ্ধ বিত্তবান্ লোকেরা সোনা ও রূপার তৈরি থালা-বাসন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থেরা কাঁসার এবং দরিদ্র লোকেরা সাধারণত মাটির ভোজন ও পানপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। বাংলার নানা প্রত্নস্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে অসংখ্য মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরা প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলকে এবং নানা প্রস্তরফলকে মাটির খেলনা, ফুলদানী, খাট, নানা আকৃতির কলস, বাটি, পান ও ভোজনপাত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকি, পুস্তকাধার প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এসব তৈজসপত্রের বহুল প্রচলন ছিল, সন্দেহ নাই। নানা সুদৃশ্য মণ্ডনালংকারযুক্ত এবং স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র আসবাবপত্রের কথা রামচরিতে উল্লিখিত আছে। এসব তৈজসপত্র সমৃদ্ধ লোকদের আয়ত্ত ছিল, সন্দেহ নাই। তবকাত-ই-নাসীরী-গ্রন্থে আছে, লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদে সোনা ও রূপার ভোজনপাত্র ব্যবহৃত হইত। কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে লোহার জলপাত্রের উল্লেখ আছে।

কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থী

কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ-গ্রন্থে কাশ্মীর-প্রবাসী গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের যে বর্ণনা দিয়াছেন একটু সবিস্তারে তাহার উল্লেখ করিতেছি। দশম-একাদশ শতকে প্রচুর গৌড়ীয় বিদ্যার্থী কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য।

ক্ষেমেন্দ্র বলিতেছেন, ইঁহাদের প্রকৃতি ও ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং অমার্জিত। ইঁহারা ছিলেন অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী; ইঁহাদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালমাত্র সার; এবং একটু ধাক্কা লাগিলেই ভাঙিয়া পড়িবেন, এই আশঙ্কায় সকলেই ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাস-যাপনের পরই কাশ্মীরের জল-হাওয়ায় ইঁহারা বেশ মেদ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। 'ওঙ্কার' ও 'স্বস্তি' উচ্চারণ যদিও ছিল ইঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কর্ম; তবু, পাতঞ্জলভাষ্য, তর্ক, মীমাংসা সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহাদের পড়া চাই (বোধ হয় কাশ্মিরী মানদণ্ডে বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণ যথেষ্ট শুদ্ধ ও মার্জিত ছিল না; ইহাই সম্ভবত ক্ষেমেন্দ্রের বক্রোক্তির কারণ)। ক্ষেমেন্দ্র আরও বলিতেছেন, গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে পথ চলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের দর্পিত মাথাটি এদিক সেদিক দোলান। হাঁটিবার সময় ময়ূরপঙ্খী জুতায় মচ্‌মচ্ শব্দ হয়; মাঝেমাঝে সুবেশ সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখেন, ক্ষীণ কটিতে লাল কটিবন্ধ। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য ভিক্ষুক এবং অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা তাঁহার তোষামোদ করিয়া গান গায় ও ছড়া বাঁধে। কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেত দন্তপংক্তিতে তাঁহাকে দেখায় যেন বানরটি। তাঁহার দুই কর্ণলতিকায় তিন-তিনটি করিয়া স্বর্ণ-কর্ণভূষণ, হাতে যষ্টি; দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কুবের। স্বল্পমাত্র অজুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন; সাধারণ একটু কলহেই ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজের সহ-আবাসিকের পেট চিরিয়া দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। গর্ব করিয়া তিনি নিজের পরিচয় দেন ঠক্কুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কম দাম দিয়া বেশি জিনিস দাবি করিয়া দোকানদারদের উত্ত্যক্ত করেন।

বসনভূষণ বিলাসব্যসন

বিদেশে বাঙালি বিদ্যার্থীর বসনভূষণ সম্বন্ধে আংশিক পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার বিস্তৃত পরিচয় লইতে হইলে বাংলাদেশের সমসাময়িক সাহিত্যগ্রন্থের এবং প্রত্নবস্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইসব সাক্ষ্য হইতে বসনভূষণের মোটামুটি একটা ছবি দাঁড় করানো কঠিন নয়।

পরিধানভঙ্গি

পূর্ব- দক্ষিণ- ও পশ্চিম- ভারতে সেলাই-করা বস্ত্র পরিধানের রীতি আদিমকালে ছিল না; সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরাটাই ছিল পুরারীতি। সেলাই-করা জামা বা গাত্রবারণ মধ্য- ও উত্তরপশ্চিম- ভারত হইতে পরবর্তী কালে আমদানি করা হইয়াছিল; কিন্তু অধোবাসের ক্ষেত্রে বাঙালি অথবা তামিল অথবা গুজরাতি মারাঠিরা ধুতি পরিত্যাগ করিয়া ঢিলা বা চুড়িদার পাজামা গ্রহণ করেন নাই। পুরুষের

অধোবাস যেমন ধুতি, মেয়েদের তেমনই শাড়ি। ধুতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙালির সাধারণ পরিধেয়, তবে একটু সংগতিসম্পন্ন লোকদের ভিতর ভদ্র বেশ ছিল উত্তরবাসরূপে আর এক খণ্ড সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার; যাহা ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না। ওড়নাই প্রয়োজনমত অবগুণ্ঠনের কাজ করিত। দরিদ্র ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ নারীদের এক বস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাঞ্চল টানিয়াই হইত অবগুণ্ঠন।

আজকাল আমরা যেমন পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঝুলাইয়া কোঁচা দিয়া কাপড় পরি, প্রাচীনকালের বাঙালি তাহা করিতেন না। তখনকার ধুতি দৈর্ঘে ও প্রস্থে অনেক ছোট ছিল; হাঁটুর নীচে নামাইয়া কাপড় পরা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম; সাধারণত হাঁটুর উপর পর্যন্তই ছিল কাপড়ের প্রস্থ। ধুতির মাঝখানটা কোমরে জড়াইয়া দুই প্রান্ত টানিয়া পশ্চাদ্দিকে কচ্ছ বা কাছা। ঠিক নাভির নীচেই দুই-তিন প্যাঁচের একটি কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টি কোমরে আটকানো; কটিবন্ধের গাঁটটি ঠিক নাভির নীচেই দোলায়মান। কেহ কেহ ধুতির একটি প্রান্ত পেছনের দিকে টানিয়া কাছা দিতেন, অন্য প্রান্তটি ভাঁজ করিয়া সম্মুখ দিকে কোঁচার মত ঝুলাইয়া দিতেন। নারীদের শাড়ি পরিবার ধরনও প্রায় একই রকম, তবে শাড়ি ধুতির মত এত খাটো নয়, পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঝুলানো, এবং বসন-প্রান্ত পশ্চাদ্দিকে টানিয়া কচ্ছে রূপান্তরিতও নয়। আজিকার দিনের বাঙালি নারীরা যেভাবে কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়া অধোবাস রচনা করেন প্রাচীন পদ্ধতিও তদনুরূপ, তবে আজিকার মতন প্রাচীন বাঙালি নারী শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করিয়া দেহ আবৃত করিতেন না; তাঁদের উত্তরদেহাংশ অনাবৃত রাখাই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বোধ হয় সংগতিসম্পন্ন উচ্চকোটি স্তরে এবং নগরে— হয়তো কতকটা মধ্য ও উত্তরপশ্চিম ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রেরণায়— কেহ কেহ উত্তরী বা ওড়নার সাহায্যে উত্তরার্ধের কিছু অংশ ঢাকিয়া রাখিতেন, বা স্তনযুগলকে রক্ষা করিতেন চোলি বা স্তনপট্টের সাহায্যে। কেহ কেহ আবার উত্তরবাসরূপে সেলাই করা 'বডিস্'-জাতীয় এক প্রকার জামার সাহায্যে স্তননিম্ন ও বাহু-উর্ধ্ব পর্যন্ত দেহাংশ ঢাকিয়া রাখিতেন। সন্দেহ নাই, এই জাতীয় উত্তরবাসের ব্যবহার নগর ও উচ্চ-কোটি স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীর সদ্যোক্ত উত্তরবাস ও তাহার শাড়ি এবং পুরুষের ধুতি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে— সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রের সাক্ষ্যে এ-তথ্য সুস্পষ্ট— নানাপ্রকার লতাপাতা ফুল এবং জ্যামিতির নক্শাদ্বারা মুদ্রিত হইত। এই ধরনের নক্শা-মুদ্রিত বস্ত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় আরম্ভ হয় খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে, এবং সিন্ধু সৌরাষ্ট্র ও গুজরাত ছিল গোড়ার দিকে এই বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। পরে ভারতবর্ষের অন্যত্রও ক্রমশ তাহা ছড়াইয়া পড়ে। এই নক্শা-মুদ্রিত বস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে ভারত-ইরান-মধ্য-

এশিয়ার ঘনিষ্ঠ শিল্প ও অলংকরণগত সম্বন্ধের ইতিহাস লুক্কায়িত। কিন্তু সেকথা এ-ক্ষেত্রে অবান্তর। যাহাই হউক, নারীদের দেহের উত্তরার্ধ অনাবৃত রাখার ঐতিহ্য শুধু প্রাচীন বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয়; বস্তুত, সমগ্র প্রাচীন আদি অস্ট্রেলীয়-পলিনেশীয়-মেলানেশীয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে ইহাই ছিল প্রচলিত নিয়ম। বলিদ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপে সেই অভ্যাস ও ঐতিহ্যের অবশেষ এখনও বিদ্যমান।

সভাসমিতি এবং বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ-বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল। জীমূতবাহন দায়ভাগ-গ্রন্থে সভাসমিতির জন্য পৃথক পোষাকের কথা বলিয়াছেন। নর্তকী নারীরা পরিতেন পায়ের কব্জি পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পাজামা; দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের উপর ঝুলাইয়া দিতেন একটি দীর্ঘ ওড়না; নৃত্যর গতিতে ওড়নার প্রান্ত উড়িত লীলায়িত ভঙ্গিতে। সন্ন্যাসী-তপস্বীরা এবং একান্ত দরিদ্রসমাজ শ্রমিকেরা পরিতেন নেংগোটি। সৈনিক ও মল্লবীরেরা পরিতেন উরু পর্যন্ত লম্বিত খাটো আঁট পাজামা, সাধারণ মজুররাও বোধ হয় কখনো-কখনো এই ধরনের পোষাক পরিতেন; অন্তত পাহাড়পুরের ফলকচিত্রের সাক্ষ্য তাহাই। শিশুদের পরিধেয় ছিল হয় হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত ধুতি নাহয় আঁট পাজামা, আর কটিতটে জড়ানো ধটী; তাহাদের কণ্ঠে দুল্যমান এক বা একাধিক পাটা বা পদক-সম্বলিত সূত্রহার।

কেশবিন্যাস

আজিকার মত প্রাচীনকালেও বাঙালির মস্তকাবরণ কিছু ছিল না। নানা কৌশলে সুবিন্যস্ত কেশই ছিল তাহাদের শিরোভূষণ। পুরুষেরাও লম্বা বাব্‌ড়ির মতন চুল রাখিতেন; কুঞ্চিত থোকায় থোকায় তাহা কাঁধের উপর ঝুলিত; কাহারও কাহারও আবার উপরে একটি প্যাঁচানো ঝুঁটি; কপালের উপর দুল্যমান কুঞ্চিত কেশদাম বস্ত্রখণ্ডদ্বারা ফিতার মতন করিয়া বাঁধা। নারীদেরও লম্বমান কেশগুচ্ছ ঘাড়ের উপর খোপা করিয়া বাঁধা; কাহারও কাহারও বা মাথার পশ্চাদ্দিকে এলানো। সন্ন্যাসী-তপস্বীদের লম্বা জটা দুই ধাপে মাথার উপরে জড়ানো। শিশুদের চুল তিনটি 'কাকপক্ষ'গুচ্ছে মাথার উপরে বাঁধা।

পাদুকা

ময়নামতি ও পাহাড়পুরের মৃৎফলক-সাক্ষ্যে মনে হয়, যোদ্ধারা পাদুকা ব্যবহার করিতেন; প্রহরী দ্বারবানেরাও করিতেন; এবং সে-পাদুকা এমনভাবে চামড়ার দ্বারা তৈরি হইত যাহাতে পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। ব্যাদিতমুখ সেই জুতা ছিল ফিতাবিহীন। সাধারণ লোকেরা বোধ হয় কোনো চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন না, যদিও কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও পিতৃদয়িত-গ্রন্থে পুরুষদের পক্ষে কাষ্ঠ

এবং চর্মপাদুকা উভয়ের ব্যবহারেরই ইঙ্গিত বর্তমান। সংগতিসম্পন্ন লোকদের মধ্যেও কাষ্ঠপাদুকার চলন খুব বেশি ছিল। বাঁশের লাঠি এবং ছাতা ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। মৃৎ ও প্রস্তর ফলকে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে ছত্র ব্যবহারের সাক্ষ্য সুপ্রচুর; লাঠির সাক্ষ্য স্বল্প হইলেও বিদ্যমান। প্রহরী, দ্বারবান্‌, মল্লবীরেরা সকলেই সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি ব্যবহার করিতেন।

প্রসাধন

সধবা নারীরা কপালে পরিতেন কাজলের টিপ এবং সীমান্তে সিঁদুরের রেখা; পায়ে পরিতেন অলক্তক, ঠোঁটে লাক্ষারস; দেহ ও মুখমণ্ডল প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন চন্দনের গুঁড়া ও চন্দনপঙ্ক, মৃগনাভি, জাফ্‌রান প্রভৃতি। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন, গৌড়ীয় পুরুষেরা হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন, বোধ হয় যুবতীদের মনোরঞ্জনের জন্য। নারীরাও নখে রং লাগাইতেন কি না, এ-বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। তবে চোখে যে কাজল তাঁহারা লাগাইতেন, তাহার ইঙ্গিত আছে দামোদরদেবের চট্টগ্রাম-লিপিতে। প্রসাধনক্রিয়ায় কর্পূরব্যবহারের ইঙ্গিত আছে মদনপালের মনহলি-লিপিতে, এবং রং ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে। ঠোঁটে লাক্ষারস (অলক্তরাগ) এবং খোপায় ফুল গুঁজিয়া দেওয়া যে তরুণীদের বিলাস-প্রসাধনের অঙ্গ, একথা সমসাময়িক বাঙালি কবি সাঞাধরও বলিয়াছেন। বিধবা হইবার সঙ্গেসঙ্গে সীমন্তের সিঁদুর যাইত ঘুচিয়া, একথার ইঙ্গিত পাইতেছি দেবপালের নালন্দা-লিপিতে, মদনপালের মনহলি-লিপিতে বল্লালসেনের অদ্ভুতসাগর-গ্রন্থে, গোবর্ধনাচার্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে—

বন্ধনভাজোঽমুষ্যাঃ চিকুর কলাপস্য মুক্তমানস্য।
সিন্দূরিত সীমন্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব॥

নারীরা গলায় ফুলের মালা পরিতেন এবং মাথার খোপায় ফুল গুঁজিতেন, এ-সাক্ষ্য দিতেছে নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি এবং কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপি। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে আছে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হইয়া পড়াতে লজ্জায় আনতনয়না নারী কথঞ্চিৎ লজ্জা নিবারণ করিতেছেন তাঁহার গলার ফুলের মালাদ্বারা বক্ষ ঢাকিয়া। বলা বাহুল্য, এ-চিত্র নাগরসমাজের উচ্চকোটি স্তরের। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্যপরিষদ-লিপি এবং সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, এই সমাজস্তরের নারীরা, বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীরা, প্রতি সন্ধ্যায় নদী বা দীঘিতে অবগাহনান্তর প্রসাধনে অলংকারে সজ্জিত শোভিত হইয়া আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতিমা হইয়া বিরাজ করিতেন। বক্ষযুগলে কর্পূর ও

মৃগনাভি রচনার সংবাদ পাওয়া যায় বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে। রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত এবং রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন নাগর-পরিবারের নারীরা বেশভূষা প্রসাধন অলংকার ইত্যাদিতে উত্তরাপথের আদর্শই মানিয়া চলিতেন; অন্তত সদ্যোক্ত বিবরণ হইতে তো তাহাই মনে হয়। রাজমহিষীরা তো ভারতবর্ষের নানা জায়গা হইতেই আসিতেন, আর নাগরসমাজে রাজপরিবারের আদর্শটাই সাধারণত সক্রিয় হয়। নগরবাসিনী বঙ্গবিলাসিনীদের বেশভূষার একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত অজ্ঞাতনামা জনৈক কবির এই শ্লোকটিতে—

বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশং কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনাম্॥

দেহে সূক্ষ্মবসন, ভুজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ (তাগা); গন্ধতৈলসিক্ত মসৃণ কেশদাম মাথার উপরে শিখণ্ড বা চূড়ার মত করিয়া বাঁধা, তাহাতে আবার ফুলের মালা জড়ানো; কানে নবশশিকলার মতন নির্মল তালপত্রের কর্ণাভরণ— বঙ্গবারাঙ্গনাদের এই বেশ কাহার না মন হরণ করে!

চন্দ্রকলার মত কোমল কচি তালপাতার কর্ণভূষণের কথা পবনদূত-রচয়িতা ধোয়ীও বলিয়াছেন; 'রসময় সুহ্মদেশে' নূতন চন্দ্রকলার মত কোমল তালীপত্র ব্রাহ্মণ-মহিলাদের কর্ণাভরণ হইবার দাবি করিয়া থাকে—

[রসময় সুহ্মদেশঃ] শ্রোত্রাভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালিপত্রং নবশশিকলা কোমলং যত্র যাতি।

রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্যজনপদবাসীদের প্রসাধনের বর্ণনা দিতে গিয়া শুধু গৌড়-রমণীর বেশ-প্রসাধনের বর্ণনাই করিয়াছেন; বোধ হয় ইহাই ছিল মানদণ্ড—

আদ্রার্দ্রচন্দন কুচার্পিত সূত্রহারঃ
সীমন্তচুম্বিসিচয়ঃ স্ফুটবাহুমূলঃ
দূর্বাগ্রকাণ্ড রুচিরাস্বগুরুপভোগাদ্
গৌড়াঙ্গনাসু চিরমেষ চকাস্তু বেষঃ॥

বক্ষে আর্দ্রচন্দন, গলায় সূতার হার, সীমন্ত পর্যন্ত আনত শিরোবসন, অনাবৃত বাহুমূল, অঙ্গে অগুরু-প্রসাধন, অঙ্গবর্ণ যেন 'দূর্বাগ্রকাণ্ড রুচির', অর্থাৎ দূর্বাদলের মত শ্যাম— ইহাই হইতেছে গৌড়াঙ্গনাদের বেশ।

নগর- ও পল্লী- বাসিনী

একদিকে নগরবাসিনীদের চিত্র, অন্যদিকে সরল স্বভাবসুন্দর পল্লীবাসিনী নারীর চিত্রও আছে। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা নগরবাসিনী বিলাসিনীদের বেশভূষা চালচলন পছন্দ করিত না। কবি গোবর্ধনাচার্য বলিতেছেন—

ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারম্।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি॥

সখি, সোজা পা ফেলিয়া চল, নাগরাচার সব ছাড়। একটু কটাক্ষপাত করিলেও এখানে পল্লীপতি (গ্রামপতি) ডাকিনী বলিয়া দণ্ড দেন।

পল্লী-সুন্দরীদের প্রসাধন-অলংকরণের কথা বলিয়াছেন কবি চন্দ্রচন্দ্র—

ভালে কজ্জলবিন্দুরিন্দুকিরণস্পর্ধী মৃণালাঙ্কুরো
দোর্বল্লীষু শলাটুফেনিলফলোত্তংসশ্চ কর্ণাতিথিঃ
ধম্মিল্লস্তিলপল্লবাভিষবণস্নিগ্ধ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থরয়ত্যনাগরবধূবর্গস্য বেশগ্রহঃ॥

কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী শাদা পদ্মমৃণালের বালা, কানে কচি রীঠাফুলের কর্ণাভরণ, স্নিগ্ধকেশ কবরীতে তিলপল্লব— অনাগর (অর্থাৎ পল্লীবাসী) বধূদের এই বেশ স্বভাবতই পথিকদের গতি মন্থর করিয়া আনে।

সাধারণ পল্লী ও নগরবাসী দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েরা গৃহকর্মাদি তো করিতেনই, মাঠে-ঘাটেও তাঁহাদের খাটিতে হইত সংসারজীবন নির্বাহের জন্য, হাটবাজারেও যাইতে হইত, সওদা কেনাবেচা করিতে হইত, আবার স্বামীপুত্রকন্যাপরিজনদের পরিচর্যাও করিতে হইত। এইরূপ কর্মব্যস্ত মেয়েদের একটি সুন্দর বস্তুময় কাব্যময় চিত্র আঁকিয়াছেন কবি শরণ। তাঁহারা যে একবস্ত্র-পরিহিতা সেকথাও শরণের এই শ্লোকটিতে জানা যায়। অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছি; এখানে শুধু একটি মর্মানুবাদ রাখিলাম—

এই যে হাটের কাজ শেষ করিয়া ধাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে পৌরাঙ্গনারা, তাহাদের দৃষ্টি সন্ধ্যাসূর্যের মত (অরুণবর্ণ)। দ্রুত ধাইয়া চলিবার জন্য তাহাদের স্কন্ধ হইতে বস্ত্রাঞ্চল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে বারবার, আর তাহাই বারবার তাহারা তুলিয়া দিতে চাহিতেছে। ঘরের চাষী সেই সকালবেলা মাঠে কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময়— এই কথা ভাবিয়া মেয়েরা লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিয়া পথ

সংক্ষেপ করিয়া আনিতেছে, আর ব্যস্ত হইয়া হাটে কেনাবেচার দাম আঙগুলে গুনিতেছে।

বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে নানাপ্রকার ক্ষৌমবস্ত্রের একটু ইঙ্গিত আছে; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে পড়িতেছি, রত্নদ্যুতিখচিত অংশুক বস্ত্রের কথা। সূক্ষ্ম কার্পাস ও রেশমবস্ত্রের কথা তো নানাসূত্রেই পাওয়া যাইতেছে। ইহা কিছু আশ্চর্যও নয়। বাংলাদেশ যে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে সুবিখ্যাত ছিল, একথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও গ্রীক পেরিপ্লাস-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া আরব বণিক সুলেমান (নবম শতক), ভিনিসিয় মার্কো পোলো (ত্রয়োদশ শতক), চীন পরিব্রাজক ফা-হুয়ান (পঞ্চদশ শতক) পর্যন্ত সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুত, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তি বা তিরহুতবাসী কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর নানাপ্রকারের পট্টাম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের মেঘ-উদুম্বর গঙ্গাসাগর গাঙ্গোর লক্ষ্মীবিলাস দ্বারবাসিনী এবং শিলহটী পট্টাম্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি বোধ হয় সমস্তই অলংকৃত পট্টবস্ত্র; কারণ ইহার পরই জ্যোতিরীশ্বর বলিতেছেন নির্ভূষণ বঙ্গাল বস্ত্রের কথা। কিন্তু 'ক্ষৌম' বা 'কৌষেয়', 'দুকুল' বা 'পত্রোর্ণ' বস্ত্র, অলংকৃত পট্টবস্ত্র বা কার্পাসবস্ত্র যাহাই হউক, সাধারণ দরিদ্র লোকদের এসব বস্ত্র পরিবার সুযোগ ও সংগতি কিছুই ছিল না; তাহাদের ভাগ্যে জুটিত মোটা নির্ভূষণ কার্পাসবস্ত্র মাত্র, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ছিন্ন ও জীর্ণ। অন্তত কবি বার এবং আরও একজন অজ্ঞাতনামা কবি বাঙালির দারিদ্র্যের যে ছবি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রধান উপকরণ 'স্ফুটিত' জীর্ণ বস্ত্র। এই দুইটি শ্লোকই সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে এই গ্রন্থের অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি, বাহুল্যভয়ে এখানে শুধু তাহার উল্লেখ রাখিয়া যাইতেছি মাত্র। সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র শুধু মেয়েরাই বোধ হয় পরিতেন; অনেকে নিজেরাই যে সে কাপড়ের সুতা কাটিয়া পাকাইয়া লইতেন, বিশেষভাবে নির্ধন ব্রাহ্মণগৃহের নারীরা, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি শুভাংকের নিম্নোদ্ধৃত রাজপ্রশস্তি শ্লোকটিতে—

> কার্পাসাস্থি প্রচয়নিচিতা নির্ধনশ্রোত্রিয়াণাং
> যেষাং বাত্যা প্রবিততকুটীপ্রাঙ্গণান্তা বভুবুঃ।
> তৎসৌধানাং পরিসরভূবি ত্বৎপ্রাসাদাদিদানীং
> ক্রীড়াযুদ্ধচ্ছিদুরযুবতীহারমুক্তাঃ পতন্তি ॥

যেসব দরিদ্র শ্রোত্রিয়দিগের ঝটিকাহত কুটিরের প্রাঙ্গণ কার্পাসবীজের দ্বারা আকীর্ণ ছিল, (হে মহারাজ), এখন তোমার কৃপায় সেখানকার সৌধাবলীর

বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যুবতীদের ক্রীড়াযুদ্ধে ছিন্নহারের মুক্তাসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

অলংকরণ

সমসাময়িক সাহিত্য ও প্রত্নবস্তুর সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন বাঙালি নারী ও পুরুষ এমন কতকগুলি অলংকার ব্যবহার করিতেন যাহা উভয় ক্ষেত্রেই এক। কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী অঙ্গুরীয়ক কণ্ঠহার বলয় কেয়ূর মেখলা ইত্যাদি নরনারী-নির্বিশেষে ব্যবহৃত হইত। নারীরা, সম্ভবত বিবাহিত নারীরা, বিশেষভাবে ব্যবহার করিতেন শঙ্খবলয়। মুক্তাখচিত হারের কথা, মহানীলরক্তাক্ষমালার কথা, বিজয়সেনের নৈহাটি-লিপিতে পাইতেছি এবং দেওপাড়া-প্রশস্তিতেই শুনিতেছি, রাজবাড়ির ভৃত্যের স্ত্রীরাও নাকি হার কর্ণাঙ্গুরী মালা মল এবং সুবর্ণবলয় ইত্যাদি পরিতেন, মূল্যবান্ পাথরের তৈরি ফুল ইত্যাদিও ব্যবহার করিতেন। মুক্তাখচিত হার পরিতেন রাজ-পরিবারের মেয়েরা (নৈহাটি-লিপি)। রামচরিতে পড়া যায়, হীরাখচিত নানা সুন্দর অলংকার এবং রত্নখচিত ঘুঙুরের কথা, মুক্তা মরকত নীলকান্তমণি চুণী প্রভৃতি রত্নাদি ব্যবহারের কথা। আর সোনা ও রূপার গহনা তো ছিলই। বলা বাহুল্য, এইসব অলংকরণ-বিলাস ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থদের নাগালের বাহিরে; বড়জোর শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার কর্ণাভরণ, এবং ফুলের মালাতেই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। দেওপাড়া-প্রশস্তিতে কবি উমাপতিধর বলিতেছেন, পল্লীবাসী নির্ধন ব্রাহ্মণরমণীরা রাজার কৃপায় নগরে আসিয়া বহুবিভবশালিনী হইলেও তাঁহার মুক্তা ও কার্পাসবীজে, মরকত ও শাক-পাতায়, রূপা ও লাউফুলে, রত্ন ও পাকা ডালিমের বীজে, সোনা ও কুমড়া ফুলে পার্থক্য যে কি তাহা জানিতেন না।

উচ্চকোটিস্তরে বিবাহোপলক্ষে কন্যাকে কিভাবে সজ্জিত ও অলংকৃত করা হইত, তাহার কিছু বর্ণনা আছে নৈষধচরিতে। প্রসঙ্গত উৎসবসজ্জার কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। প্রথমেই কুলাচার-অনুসারে সধবা ও পুত্রবতী গৃহিণীরা মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে কন্যাকে স্নান করাইতেন এবং পরে শুভ্র পট্টবস্ত্র পরাইতেন। তারপর সখীরা দময়ন্তীকে কপালে পরাইলেন মনঃশিলার তিলক, সোনার টিপ, কাজল আঁকিয়া দিলেন চোখে, কর্ণযুগলে পরাইলেন দুইটি মণিকুণ্ডল, ঠোঁটে লাক্ষা, কণ্ঠে সাতলহর মুক্তার মালা, দুই হাতে শঙ্খ ও স্বর্ণবলয়, চরণে আলতা। বিবাহের মাঙ্গলিকানুষ্ঠানে অভ্যস্তা অন্তঃপুরিকারা স্ত্রী-আচারগুলি পালন করিতেন, আর পুরুষেরা ও ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত কার্যগুলি সম্পাদন করিতেন। বিবাহ-স্থানে আলপনা আঁকা হইত এবং কাজটি করিতেন মেয়েরা। শিল্পীরা নানাপ্রকার রঞ্জিত কাপড় দিয়া তৈরি ফুলে নগরের পথ-ঘাট সাজাইতেন, বাড়ির দেয়ালে নানা ছবি আঁকিতেন। নানাপ্রকার বাদ্যের

মধ্যে বাঁশি বীণা করতাল মৃদঙ্গ ছিল প্রধান। বরযাত্রাকালে নগরীর নারীরা বরকে দেখিবার জন্য রাজপথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষে গৃহতোরণের দুইপাশে কদলীস্তম্ভ রোপণ করা হইত; বাসরঘরে (কৌতুকগৃহে) আজিকার মতন তখনও চুপি দেওয়া এবং আড়িপাতা হইত (সকৌতুকাগারমগাত্ পুরন্ধ্রিভিঃ সহস্র রন্ধ্রোকৃতমীক্ষিতুংততঃ। অধাত সহস্রাক্ষতনুত্রমিত্রতাং অধিষ্ঠিতং যত্ খলু জিষ্ণুনাম্না॥); এবং বরকন্যার গাঁটছাড়াও বাঁধা হইত। বরযাত্রীদের পরিচর্যা এবং ভোজনে পরিবেশন করিতেন পুরনারীরা এবং তাঁদের লইয়া বরযাত্রীরা নানাপ্রকার ঠাট্টা-রসিকতা করিতেও ছাড়িতেন না; সেসব ঠাট্টা ও রসিকতা আজিকার দিনে খুব মার্জিত বলিয়া মনে হইবার কারণ নাই। পুরনারীরাও নানাপ্রকারে বরযাত্রীদের ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন, আজও যেমন করা হয়। নল-দময়ন্তীর বিবাহবর্ণনা-সাক্ষ্যে মনে হয়, বিবাহের পরও বর ও বরযাত্রীরা বিবাহ-বাড়িতে চার-পাঁচ দিন বাস করিতেন। সেই কয়েকদিনও বরযাত্রীরা বারসুন্দরী বা বাররামাদের সঙ্গলাভ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। বস্তুত, সৌখীন উচ্চস্তরে যুবকদের মধ্যে বাররামাসঙ্গ বোধ হয় খুব দোষের বলিয়া গণ্য হইত না।

বসন-ভূষণ-প্রসাধন-অলংকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা টুকরাটাকরা খবর নানা দিক হইতে পাওয়া যায়। ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে (আনুমানিক তৃতীয় শতক) বলিতেছেন, 'গৌড়ীনামলকপ্রায়ং সশিখাপাশবেণিকম্'—অর্থাৎ গৌড়ীয় নারীদের মাথায় কুঞ্চিত কেশ, এবং তাহাদের চুলের বেণীর শেষাংশ থাকিত শিখার মত মুক্ত। রাজশেখর (নবম-দশম শতক) তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে অঙ্গ-বঙ্গ-সুহ্ম-ব্রহ্ম-পুণ্ড্র প্রভৃতি প্রাচ্যবাসীদের বেশ (বেষ) বর্ণনা উপলক্ষ্যে গৌড়-নারীর বেশের (বেষের) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

দেহবর্ণ

প্রাচীন বাঙালির দেহবর্ণ কিরূপ ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ভরত-নাট্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে—

> শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পহ্লবা বহ্লিকাদয়ঃ
> প্রায়েণ গৌরাঃ কর্তব্যা উত্তরাং যে শ্রিতাদিশম।
> পাঞ্চালাঃ শূরসেনাশ্চ তথা চৈবোড্রমাগধাঃ
> অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাস্তু শ্যামা কার্যাস্তু বর্ণতঃ॥

(নাটকের) শক-যবন-পহ্লব-বাহ্লিক প্রভৃতি যেসব (পাত্রপাত্রী) উত্তর দেশবাসী তাহাদের দেহের বর্ণ করিতে হইবে সাধারণত গৌর; পঞ্চাল শূরসেন উড্র মগধ এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গবাসীদের বর্ণ করিতে হইবে শ্যাম।

রাজশেখরও বলিতেছেন, 'তত্র পৌরস্ত্যানাং (প্রাচ্যবাসীদের) শ্যামো বর্ণঃ, দাক্ষিণাত্যানাং কৃষ্ণঃ, পাশ্চাত্যানাং পাণ্ডুঃ, উদীচ্যানাং গৌরঃ, মধ্যদেশ্যানাং কৃষ্ণঃ, শ্যামো গৌরশ্চ।' গৌরাঙ্গনাদের দেহও যে শ্যামবর্ণ, রাজশেখরের এই উক্তি আগেই উল্লেখ করিয়াছি; অন্যত্রও তিনি বলিতেছেন—

শ্যামেষ্বঙ্গেষু গৌড়ীনাং সুত্রহারৈর্হারিষু।
চক্রীকৃত্য ধনুঃ পৌষ্পমনঙ্গো বস্তু বল্গতি।

এইসব উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গৌড়বাসীদের তথা প্রাচ্যবাসীদের দেহবর্ণ সাধারণত ছিল শ্যাম, তবে রাজপরিবার এবং অন্যান্য অভিজাত পরিবারের নরনারীদের দেহবর্ণ যে অনেক সময় হইত গৌর তাহাও রাজশেখর বলিয়াছেন, 'বিশেষস্তু পূর্বদেশে রাজপুত্র্যাদীনাং গৌরঃ পাণ্ডুর্বা বর্ণঃ'।

খ্রীস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই বাংলাদেশ স্বল্পাংশে হইলেও উত্তর-ভারতীয় সদাগরী ধনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তর-ভারতের নাগর-সভ্যতার স্পর্শও তাহার অঙ্গে লাগিয়াছিল। বাৎস্যায়নীয় নাগরাদর্শ বাংলার নাগর-সমাজেরও আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুত, বাৎস্যায়ন-প্রদত্ত বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ভিন্-প্রদেশীরা গৌড়বঙ্গের যুবকযুবতীদের বিলাসব্যসনকে খুব সুনজরে দেখিতেন না। স্মৃতিকার বৃহস্পতির কয়েকটি শ্লোক দেবলভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা-গ্রন্থে ও ভট্টনীলকণ্ঠের ব্যবহারময়ূখ-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহা হইতে জানা যায়, বৃহস্পতি দুই কারণে বাঙালি দ্বিজবর্ণের লোকদের নিন্দা করিয়াছেন: প্রথম কারণ, তাঁহাদের মৎস্যভক্ষণ; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহাদের সমাজের নারীরা দুর্নীতিপরায়ণা। শুধু বাৎস্যায়নের কালেই নয়, তাহার পরেও প্রাচীন বাঙালি বোধ হয় সংযম-অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় নাই। ধোয়ীর পবনদূতেও দেখিতেছি, বিলাসব্যসন চরিতার্থতার অবাধলীলা কবি সোৎসাহে এবং সাড়ম্বরে বিবৃত করিয়াছেন। পবনদূত এবং রামচরিত উভয় কাব্যেই যেভাবে সভানন্দিনীদের উচ্ছ্বসিত স্তুতিগান এবং তাহাদের বিলাসলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নাগর-সমাজের সমৃদ্ধ উচ্চস্তরে ইঁহাদের আকর্ষণ ও প্রভাব স্বল্প ছিল না, এবং ইঁহারা নাগর-সমাজের বিশেষ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপি ও বিশ্বরূপসেনের সাহিত্যপরিষদ-লিপিতে আছে, প্রতি সন্ধ্যায় এইসব সভানন্দিনীদের নূপুর-ঝংকারে সভা আমোদগৃহগুলি পরিপূরিত হইত। সন্দেহ নাই, রাজসভায় এবং বিত্তবান্ সমাজে এই নন্দিনীদের বিশেষ-একটা স্থান ছিল। তাহা ছাড়া নগরে ও গ্রামে বিত্তবান্দের ঘরে দাসী রাখার প্রথা যে প্রায় সর্বব্যাপী ছিল তাহা তো জীমূতবাহনই দায়ভাগ-গ্রন্থে বলিয়াছেন; এবং টীকাকার মহেশ্বর এ-সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা খুব

প্রশংসনীয় নয়। এই ধরনের দাসী রাখার প্রথা বাংলাদেশে বহুদিন প্রচলিত। বাৎস্যায়নও ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দাসীরা অস্থাবর সম্পত্তির মত যথেচ্ছ ক্রীত ও বিক্রীত হইতেন; দায়ভাগ-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, উত্তরাধিকারসূত্রে একাধিক ব্যক্তি যদি একটিমাত্র দাসীর অধিকারী হন, তাহা হইলে সেই দাসী প্রত্যেকের অংশানুযায়ী পর পর প্রত্যেকের অধিকারে থাকিবেন।

এর উপর ছিল আবার দেবদাসীপ্রথা। বাংলাদেশে এই প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় অষ্টম শতকে, এবং তাহা কল্‌হনের রাজতরঙ্গিনী-গ্রন্থে নর্তকী কমলা প্রসঙ্গে। কমলা ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনের কোনো মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী, নৃত্যগীতবাদ্যে সুনিপুণা, বিবিধ কলায় কলাবতী। দেবদাসীরা সাধারণত প্রায় সকলেই নানা কলানিপুণা হইতেন; কমলা আবার তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আরও উচ্চস্তরের। কিন্তু তাহা হইলেও দেবদাসীদের সঙ্গে বাররামাদের পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না। রামচরিত-কাব্যে তো ইঁহাদের স্পষ্টত দেব-বারবনিতাই বলা হইয়াছে; পবনদূতে বলা হইয়াছে বাররামা। কল্‌হনের সুদীর্ঘ কমলা-কাহিনী প্রসঙ্গে সমসাময়িক বাংলার দেবদাসীদের জীবনযাত্রা এবং সমাজের উচ্চকোটির লোকদের নৈতিক আদর্শ, বাসনা ও ব্যসনের মোটামুটি একটু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পাল-আমলে এই প্রথা খুব বিস্তৃত ছিল না।; পরে দক্ষিণী প্রভাব ও সংস্পর্শের ফলে ক্রমশ দেবদাসীপ্রথা দেশে বিস্তার লাভ করে এবং সেন-বর্মন-আমলে দেবদাসীরা সমাজের উচ্চস্তরের মন ও কল্পনা, কামনা ও বাসনাকে একান্তভাবে অধিকার করিয়া বসেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তি এবং ভট্টভবদেবের লিপিতে যেভাবে ইঁহাদের বিলাসলাস্য ও সৌন্দর্যলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রশস্তিকারেরা যেভাবে ইঁহাদের উপর কবিকল্পনার সুনির্বাচিত রূপকালংকার বর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে এ-সম্বন্ধে সংশয়ের আর কিছু নাই। ধোয়ী কবি ইঁহাদের আখ্যা দিতেছেন বাররামা, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই বলিতেছেন, ইঁহাদের দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মী যেন স্বয়ং সুহ্মদেশে অবতীর্ণা হইয়াছেন তাঁহার পতি মুরারির পাশে। তিনিই ইঙ্গিত করিতেছেন, সেন-বংশীয় রাজাদের পাশে সর্বদা স্বভাবসুন্দরী বারনারীরা অবস্থান করিতেন, মনে হইত যেন মুরারির পাশে লক্ষ্মী। আর, ভবদেবভট্ট বিষ্ণুমন্দিরে উৎসর্গীকৃত শত দেবদাসীর সম্বন্ধে যেসব স্তুতিবাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আজিকার মানুষও খুব সহজভাবে সহ্য করিবে না।

ব্রাহ্মণাদর্শ

অথচ, অন্যদিকে সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-গ্রন্থাদি পড়িলে মনে হয়, সমাজের নৈতিকাদর্শ উচ্চে তুলিয়া ধরিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ব্রাহ্মণ্য লেখকেরা এবং সমাজের নেতারা সকল প্রকার দুর্নীতি এবং সংযমশাসনবিহীন বল্গাহীন কাম-

বাসনার বিরুদ্ধে নিজেদের কণ্ঠ ও লেখনী নিয়োগ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক লিপিমালা পাঠ করিলে স্বতই মনে হয়, তাঁহারা জনসাধারণের সম্মুখে যেসব নৈতিকাদর্শ তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন তাহা চিরাচরিত ঔপনিষদিক, পৌরাণিক এবং রামায়ণ-মহাভারতীয় ব্রাহ্মণ্য নৈতিকাদর্শেরই সমষ্টি; সে-আদর্শ পাতিব্রত্যের, শুভ্র শুচিতার, স্থৈর্য ও সংযমের, শ্রী শীলতা ও ঔদার্যের, দয়া দান ও ক্ষমার। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে সর্বপ্রকারের দুর্নীতি, কামাতুরতা, মদ্যাসক্তি, চৌর্য ইত্যাদির নিন্দা করা হইয়াছে, এবং এইসব অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ডের এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গেসঙ্গে অনুশীলন করিতে বলা হইয়াছে সত্য দান শুচিতা দয়া এবং সংযম প্রভৃতি গুণের।

পল্লীর জীবনাদর্শ

আংশিকত এই ধরনের আদর্শপ্রচারের ফলে, আংশিকত বৃহত্তর পল্লীসমাজের ধনোৎপাদন-ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবনবিন্যাসের ফলে সাধারণভাবে প্রাচীন বাঙালি-জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইতে পারে নাই। যেসব বিলাসব্যসন ও অসংযত কামনা-বাসনার কথা একটু আগে বলিয়াছি, তাহা সাধারণত নাগর-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; পল্লীবাসীরা এইসব নাগরাচার পছন্দ করিতেন না, এবং ইহাদের বিরুদ্ধে পল্লীপতিদের দৃষ্টি সদাজাগ্রত ছিল। গোবর্ধনাচার্যের একটি শ্লোকে তাহার আভাস আগেই আমরা পাইয়াছি। বৃহত্তর পল্লীসমাজে জীবনের একটি সরল শান্ত সহজ আদর্শ ছিল সক্রিয়, এবং সমসাময়িক কালের এই অদার্শকে ব্যক্ত করিয়াছেন কবি শুভাংক—

বিষয়পতিরলুব্ধ ধেনুভির্ধাম পূতং
কতিচিদভিমতায়াং সীম্নি সীরা বহন্তি।
শিথিলয়তি চ ভার্যা নাতিথেয়ী সপর্য্যাম
ইতি সুকৃতিমনেন ব্যঞ্জিতং নঃ ফলেন॥

বিষয়পতি (অর্থাৎ, স্থানীয় শাসনকর্তা) লোভহীন, ধেনুদ্বারা গৃহ পবিত্র, নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চাষ হয়, অতিথি-পরিচর্যায় গৃহিণী কখনও ক্লান্ত হন না— এইসব ফল দ্বারা ইঁহার পুণ্য (বা সুকৃতি) আমাদের নিকট ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

ইহাই ছিল পল্লীবাসী কৃষিনির্ভর প্রাচীন বাঙালি-সমাজের মধ্যবিত্ত লোকদের জীবনাদর্শ। এই সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শের ইঙ্গিত প্রাকৃতপৈঙ্গলের দুই-একটি পদেও পাওয়া যায়—

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধণা ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমনা।
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর বব্বর সগ্‌গমণা॥

পুত্র পবিত্রমনা, প্রচুর ধন, স্ত্রী ও কুটুম্বিনীরা শুদ্ধচিত্তা, হাঁকে ত্রস্ত হয় ভৃত্যগণ—এইসব ছাড়িয়া কোন্ বর্বর স্বর্গে যাইতে চায়।

অন্য-একটি পদে আছে—

সের এক্ক জই পাঅই ঘিত্তা
মণ্ডা বীস পকাইল ণিত্তা॥
টঙ্ক এক্ক জই সিন্ধব পাআ।
জো হউ রঙ্ক সো হউ রাআ॥

এক সের ঘী যদি পাই তবে নিত্য বিশটা মণ্ডা পাকাই; যদি এক টাকার সৈন্ধব পাওয়া যায় তবে হোক সে নিঃস্ব, তবু সে রাজা।

দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজে বাঙালির সনাতন দুঃখকষ্ট লাগিয়াই ছিল : 'হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপবাস, অথচ ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে', 'ক্ষুধায় শিশুদের চোখ ও পেট বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের দেহ শবের মত শীর্ণ', 'ভাঙা কলসীতে এক ফোঁটা মাত্র জল ধরে', 'পরিধানে জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করিবার মত সুঁচও নাই ঘরে', 'ভাঙা কুঁড়েঘরের খুঁটি নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে'—এইসব ছবি সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়।

দারিদ্র্যাভিশাপক্লিষ্ট নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ বোধ হয় ছিল গ্রামের বিচিত্র সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ির পার্বণ-ব্রত, সম্পন্নতর গৃহের পূজা-উৎসব, এবং দরিদ্রতর স্তরের নানা আদিম কৌমগত যৌথনৃত্যগীত ও পূজা। এইসব আশ্রয় করিয়াই মাঝেমাঝে তাঁহারা তাঁহাদের দৈনন্দিন দারিদ্র্য-দুঃখ মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

বাঙালি কবিকুলরচিত সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত নানা প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি হইতে দশম-একাদশ শতকের বাঙালির নানা টুকরাটাকরা জীবনচিত্র কল্পনায় আঁকিয়া তোলা যায়। বর্ষায় গ্রাম্য কৃষকযুবকের সুখস্বপ্ন আঁকিয়াছেন কবি যোগেশ্বর; হেমন্তে বাংলার গ্রামাঞ্চলের শোভা ও সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা, বাংলার ভাষা, বাংলার ধর্মকর্ম—বিশেষভাবে শিব ও গৌরী কল্পনা, সাধারণ মানুষের প্রেম সুখদুঃখ দারিদ্র্য ঋতুচর্যা যুদ্ধ শৌর্য কীর্তি প্রভৃতি—সম্বন্ধে নানা শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বাংলার জনসাধারণের যেসব চিত্র এই শ্লোকগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যে শুধু সুন্দর বস্তুময় এবং কাব্যময় তাহাই নয়, অন্য উপাদান ও অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণে তাহা দুর্লভ। কিন্তু বাঙালি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আজও এইসব সমসাময়িক জীবন-সাক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই।

চর্যাগীতিতে গার্হস্থ্যজীবনের চিত্র

চর্যাগীতির অনেকগুলি গীতেও বাঙালির সমসাময়িক গার্হস্থ্যজীবনের চিত্র পাওয়া যায়। দেশে চোরডাকাতের উপদ্রব বোধ হয় বেশ ছিল, শক্ত প্রহরীর প্রয়োজন হইত, দরজায় তালা লাগাইতে হইত। কাহ্নপাদ বলিতেছেন—

সুনবাহ তথতা পহারী।
মোহ ভাণ্ডার লই সঅলা অহারী॥

শূন্য গৃহে তথতা প্রহরী; মোহভাণ্ডার সকলই কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। আর, সহরপাদের দোহায় আছে—

জই পবন-গমন-দুআরে দিঢ় তালা বি দিজ্জই।

ঘরে তালা লাগাইবার ইঙ্গিত চর্যাপদেও আছে; আয়না ব্যবহারের কথাও আছে। চুরিডাকাতি যে হইত, সন্দেহ কি? একটি গীতে কুক্কুরীপাদ বলিতেছেন—

আঙগণ ঘরপণ সুন বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥

অঙ্গন ঘরের কোণেই; হে অবধূতি, শোনো, কানেট অর্ধরাত্রে চোরে লইয়া গেল; শ্বশুর পড়িল ঘুমাইয়া, বহুড়ি আছে জাগিয়া, কানেট নিল চোরে, কোথায় গিয়া আবার তাহা মাগিবে! (কানের গহনা কানে পরিয়াই ঘরের বৌ পড়িয়াছিল ঘুমাইয়া, মাঝরাত্রে চোর আসিয়া গহনাটি চুরি করিয়া লইয়া গেল। শ্বশুর তখনও ঘুমে; কিন্তু ভয়ে ভয়ে জাগিয়া বসিয়া আছে বৌ। মনে বড় ভয় ও ভাবনা; চোরের ভয় একদিকে, অন্যদিকে গহনাটি চুরি গিয়াছে—লজ্জা ও অর্থদণ্ড দুইই। কার কাছে চাহিলেই বা গহনা আর পাওয়া যাইবে)।

এই গীতটির মধ্যে ঘরের বৌ-এর একটু চঞ্চল চরিত্রের ইঙ্গিতও যে নাই, এমন নয়। ভয় ও লজ্জা কতকটা সেইজন্যও; শ্বশুর কি বলিবেন, এই ভাবনা। এই গীতে একটু পরেই আছে, বৌটির এতই ভয় যে, দিনের বেলা কাকের ভয়েই চীৎকার করিয়া ওঠে, অথচ রাত্রি হইলেই কোথায় যে চলিয়া যায়—

দিবসই বহুড়ি কাগ ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥

এই পদটিতে অসতী কুলবধূ সম্বন্ধে সর্বভারত-প্রচলিত একটি উক্তির প্রতিধ্বনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

তখনকার দিনেও গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর একত্র বসিয়া খাওয়া নিন্দনীয় ছিল, দেশাচারে অসিদ্ধ ছিল। দোহাকোষে আছে—

ঘরবই খজ্জই ঘরিণী এহি জঁহি দেসহি অবিসার।

যৌতুকের লোভে অনেকেই নিম্নজাতের ভিতর হইতে কন্যাগ্রহণেও আপত্তি করিতেন না।

বঙ্গালদেশের সঙ্গে বোধ হয় তখনও পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের বিবাহাদি সম্পর্ক প্রচলিত ছিল না। তাহা ছাড়া, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গবাসীরা বোধ হয় বঙ্গালবাসীদের খুব প্রীতির চক্ষেও দেখিতেন না। সহরপাদের একটি দোহায় আছে, 'বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণানা', অর্থাৎ, বঙ্গে (পূর্ববঙ্গ হইতে) লইয়াছিস্ স্ত্রী, পরে (তাহার ফলে) ভাগিল তোর বিজ্ঞান (তোর বুদ্ধি গেল খোয়া)। ভুসুকুপাদের একটি গানে আছে, ভুসুকু যেদিন চণ্ডালীকে নিজের গৃহিণী করিলেন সেদিন তিনি যথার্থ বঙ্গালী হইলেন। অর্থ বোধ হয় এই যে, আগে শুধু জন্মে বঙ্গালী ছিলেন, চণ্ডালীকে যোগসঙ্গিনী করায় যথার্থ বঙ্গালী হইলেন।

দোহাকোষে একটি অর্থবহ দোহা আছে। পরনারীতে আসক্ত পুরুষদের দোহাকার উপদেশ দিতেছেন—

নিঅ ঘরে ঘরিণী জাব ণ মজ্জই।
তাব কি পঞ্চবণ্ণ বিহারিজ্জই॥

নিজের ঘরে আপন গৃহিণী যে পর্যন্ত না মজেন সে পর্যন্ত কি পঞ্চবর্ণে বিহার করা যায়?

শবরশবরী ও অন্যান্য অন্ত্যজ বর্ণের জীবনযাত্রা

চর্যাগীতির একাধিক গীতে ইঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। ইঁহারা বাস করিতেন বড় বড় পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরচূড়ায়। কাহ্নুপাদ বলিতেছেন—

বরগিরিসিহর উত্তুঙ্গ মুণি সবরেঁ জহি কিঅ বাস।

শবরপাদের একটি গীতে শবরশবরীদের পার্বত্য জীবনযাত্রার সুন্দর বর্ণনা আছে। জনবসতি হইতে দূরে উচ্চ পর্বতে শবরশবরীদের বাস; শবরী গুঞ্জার মালা পরেন গলায়, কটিতে জড়ান ময়ূরের পাখ্, কানে পরেন কুণ্ডল। উন্মত্ত শবর নেশার ঝোঁকে শবরীকে যান ভুলিয়া; তখন শবরী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আবার ঘর

সামলান। কুঁড়ে ঘরে খাটিয়ার উপর তাঁহাদের সুখশয়ন; সেই খাটিয়ায় নিবিড় তাঁহাদের মিলন। তাম্বুল (পান) আর কর্পূর তাঁহাদের পূর্বরাগের উপাদান। শরধনু লইয়া শিকার তাঁহাদের জীবিকা। এক-একদিন শবর রাগ করিয়া অনেক-দূরে পাহাড়ের গুহায় চলিয়া যান; শবরী তখন একা একা তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়ান।

এই শবরপাদেরই (ইনি কি নিজেই শবর ছিলেন?) আর-একটি গীত আছে শবরদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে; এ-চিত্রটিও সুন্দর ও বস্তুময়—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিয়েঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী॥...
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসম সমতুলা।
সুকড় এ সেরে কপাসু ফুটিলা॥...
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরশবরী মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা॥
চারিপাসেঁ ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী॥

পাহাড়ের উপর প্রায় আকাশের গায়ে শবরশবরীর বাড়ি; বাড়ির চারধারে কার্পাস-গাছে ফুল ফুটিয়া আছে। চিনা ধান (কাগনী ধান) পাকিয়াছে, আর শবর-শবরীদের জীবনে উৎসব লাগিয়াছে। চারিদিকে শকুন আর শেয়ালের বড় উপদ্রব; ইহারা ক্ষেতে পড়িয়া পক্ক শস্য নষ্ট করে, বাঁশের চাঁচারির বেড়া দিয়া সেইজন্য চিনা ধানের ক্ষেত রক্ষা করিতে হয়। ইঁদুরের উপদ্রবও ছিল; একটি চর্যাগীতে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

ডোম নিষাদ প্রভৃতিরা গ্রামের বাহিরে উঁচু জায়গায় বাস করিতেন; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা ইঁহাদের ছুঁইতেন না। নৌকায় ছিল ইঁহাদের যাওয়া আসা; বাঁশের তাঁত, চাঙাড়ি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রয় ছিল ইঁহাদের বৃত্তি। নলের তৈরি পেটিকা ছাড়িয়া লোকেরা বাঁশের এইসব জিনিস কিনিত। একাধিক চর্যাগীতে এইসব উক্তির সাক্ষ্য বিদ্যমান। বাংলাদেশের নানা জায়গায় এই ধরনের নিম্নজাতীয় যাযাবর নরনারী আজও দেখা যায়; নৌকাই ইঁহাদের বাড়িঘর, এবং আজও বাঁশের নানা জিনিস তৈরি করিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করা ইঁহাদের ব্যাবসা। মৎস্যজীবী তন্তুবায় ধুনুরী সূত্রধর প্রভৃতি বৃত্তির লোকদের সাক্ষাৎও চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের বিশেষ-বিশেষ বৃত্তির টুকরাটাকরা ছবিও দৃষ্টিগোচর হয়। একটি গীতে সূত্রধর বা ছুতোর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

জো তরু ছেব ভেবউ ন জানই।

যে গাছ ছেদন ও ভেদনের কৌশল জানে না।

স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে, এই দুই কর্মেরই একটা বিশেষ কৌশল ছিল যাহা সকলের আয়ত্ত ছিল না।

অন্ত্যজ বর্ণের যাযাবার ডোম শবর পুলিন্দ নিষাদ বেদে প্রভৃতিদেরই অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ-খেলানো, যাদুবিদ্যার নানা খেলা দেখানো ইত্যাদি। সাপের উপদ্রব খুবই ছিল; মনসা-পূজাই তাহার অন্যতম সাক্ষ্য। রাজসভায় জাঙ্গলিক বা বিষবৈদ্য অন্যতম রাজপুরুষ ছিলেন; জাঙ্গুলী সাপেরই অন্য নাম। সাপের কামড়ে অনেককেই প্রাণ দিতে হইত। সেইজন্য ওঝা বা বিষবৈদ্যদের সমাজে একটা স্থান ছিল; ইঁহারাই ছিলেন সাপুড়ে। উমাপতিধরের একটি শ্লোকে এই সাপ-খেলানোর সুন্দর বর্ণনা আছে—

> ক্ষুদ্রাস্তে ভুজগাঃ শিরাংসি নময়ত্যাদায় যেষামিদং
> ভ্রাতর্জাঙ্গলিক ত্বদাননমিলন্মন্ত্রানুবিন্ধং রজঃ।
> জীর্ণস্তেষফণী ন যস্য কিমপি ত্বাদৃগগুণীন্দ্রব্রজা-
> কীর্ণক্ষ্মাতলধাবনাদপি ভজত্যানম্রভাবং শিরঃ॥

ভাই জাঙ্গলিক (সাপুড়ে), তোমার এই সাপগুলি ছোট ছোট; তোমার মুখের মন্ত্রপড়া-ধুলি ইহাদের মাথা নমিত করিয়া দিতেছে। এই ফণাধারী সাপটি বোধ হয় জীর্ণ (অর্থাৎ প্রবীণ বা অভিজ্ঞ), কেননা তোমার মত গুণীন্দ্বারা পূর্ণ মাটিতে ধাবন করিয়াও ইহার মাথা নম্রভাব হইতেছে না (অর্থাৎ নমিত হইতেছে না)।

গোবর্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে আছে—

> কিং পরজীবৈদীর্ব্যসি বিস্ময়মধুরাক্ষি গচ্ছ সখি দূরম্।
> অহিমধিচত্বরতুরগগ্রাহী খেলয়তু নির্বিঘ্নঃ॥

হে সখি, সাপ-খেলা দেখিতে দেখিতে তোমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া মধুরতর দেখাইতেছে। অতএব, কেন তুমি পরের জীবনকে বিপদাপন্ন করিতেছ? তুমি দূরে সরিয়া যাও, সাপুড়ে প্রাঙ্গণে নির্বিঘ্নে সাপখেলা দেখাক্।

সর্বানন্দ বলিতেছেন, বেদিয়ারা সাপ-খেলা দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত।

নারীসমাজ

বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে গৌড়ের নারীদের মৃদুভাষিণী অনুরাগবতী এবং কোমলাঙ্গী বলিয়া (মৃদুভাষিণ্যোঽনুরাগবত্যো মৃদ্বঙ্গ্যশ্চগৌড়্যঃ) তৃতীয়-চতুর্থ

শতকে যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও মোটামুটি সত্য বলিলে ইতিহাসের অপলাপ করা হয় না। কিন্তু বাৎস্যায়নের উক্তির ভিতর প্রাচীন বাঙালি নারীর সমগ্র ছবিটি পাইতেছি না; সে-চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার উপাদানও অত্যন্ত অল্প।

গোড়াতেই বলা চলে, বৃহত্তর হিন্দুসমাজের গভীরে—শিক্ষিত নাগর-সমাজের কথা বলিতেছি না—আজও যেসব আদর্শ আচার ও অনুষ্ঠান সক্রিয়, প্রাচীন বাঙালিসমাজেও তাহাই ছিল; যেসব সামাজিক রীতি ও অনুষ্ঠান পল্লী- ও নগর-বাসী সাধারণ নারীরা দৈনন্দিন জীবনে আজও পালন করিয়া থাকেন, যেসব সামাজিক বাসনা ও আদর্শ পোষণ করেন, প্রাচীন বাঙালি নারীদের মধ্যেও মোটামুটি তাহাই সক্রিয় ছিল। বাংলার লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। যে অসবর্ণ-বিবাহ আজও বৃহত্তর হিন্দুসমাজে সুপ্রচলিত এবং সু-আদৃত নয়, অথচ মাঝেমাঝে তেমন ঘটিয়াও থাকে, এবং সমাজ ক্রমে সেই বিবাহ স্বীকার করিয়াও লয়, প্রাচীন বাংলায়ও অবস্থাটা ঠিক তাহাই ছিল। দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাঙালি-রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে অসবর্ণ-বিবাহের কোনো বিধান নাই; সবর্ণে বিবাহই ছিল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অসবর্ণ-বিবাহ যে প্রাচীন বাংলায় একেবারে অপ্রচলিত ছিল না তাহার প্রমাণ সমতট-রাজ লোকনাথের মাতামহ পারশব কেশব। কেশবের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু মাতা বোধ হয় ছিলেন শূদ্রকন্যা; কেশবের পারশব পরিচয়ের ইহাই কারণ। কিন্তু তাহাতে কেশবকে সমাজে কিছু হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই, তাঁহার কন্যা গোত্রদেবী বা দৌহিত্র লোকনাথকেও নয়। কিন্তু কেবল সপ্তম শতকেই বোধ হয় নয়, পরেও এই ধরনের অসবর্ণ-বিবাহ কিছুকিছু সংঘটিত হইত; নহিলে পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় সুলতান জলাল্-উদ্-দীন বা যদুর সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী বাঙালি বৃহস্পতিমিশ্র যে স্মৃতি-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য নিম্নতর বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণে কোনো বাধা নাই, এ-বিধান দিবার কোনো প্রয়োজন হইত না।

বাংলার পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি পড়িলে মনে হয় লক্ষ্মীর মত কল্যাণী, বসুধার মত সর্বংসহা স্বামীব্রতনিরতা নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালি নারীর চিত্তাদর্শ; এবং বিশ্বস্তা সহৃদয়া বন্ধুসমা এবং স্থৈর্য শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপা স্ত্রী হওয়াই ছিল তাঁহাদের একান্ত কামনা। স্বামীর ইচ্ছাস্বরূপিনী হওয়াই তাঁহাদের বাসনা; এবং শামুক যেমন প্রসব করে মুক্তা, তেমনই মুক্তাস্বরূপ বীর ও গুণী পুত্রের প্রসবিনী হওয়াই সকল বাসনার চরম বাসনা। বন্ধ্যা নারীর জীবন কেহই কামনা করিতেন না। লিপির পর লিপিতে এইসব কামনা বাসনা ও আদর্শ নানা প্রসঙ্গে বারবার ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্চকোটি শিক্ষিত সমাজে মাতা ও পত্নীর সম্মান ও মর্যাদা এইজন্যই বেশ উচ্চই ছিল, সন্দেহ নাই। লিপিগুলিতে উভয়েরই সম্বন্ধ ও সসম্মান উল্লেখ তাহার সাক্ষ্য; কোনো-কোনো রাজকার্যে রাজ্ঞীর অনুমোদন গ্রহণও তাহার অন্যতম সাক্ষ্য।

রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক বিচিত্র নারীচরিত্রের সঙ্গে সমসাময়িক নারীদের তুলনায় এবং প্রাসঙ্গিক উল্লেখের ভিতর দিয়া সমসাময়িক নারীজীবনের আদর্শ ও কামনা লিপিমালায় আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ধর্মপালের মাতা দেদ্দদেবীর তুলনা করা হইয়াছে চন্দ্রদেবতার পত্নী রোহিণী, অগ্নিপত্নী স্বাহা, শিবপত্নী সর্বাণী, কুবেরপত্নী ভদ্রা, ইন্দ্রপত্নী পৌলোমী এবং বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে। শ্রীচন্দ্রের পত্নী শ্রীকাঞ্চনার তুলনা করা হইয়াছে শচী গৌরী এবং শ্রীর সঙ্গে। ধবলঘোষের পত্নী সদ্ভাবা তুলিতা হইয়াছেন ভবানী সীতা, আর বিষ্ণুজায়া পদ্মা এবং বিজয়সেনমহিষী বিলাসদেবী লক্ষ্মী এবং গৌরীর সঙ্গে। সমসাময়িক কামরূপ-শাসনাবলীতেও এই ধরনের তুলনাগত উল্লেখ অনেক আছে।

মাতার কামনা ছিল শুভ্র নিষ্কলঙ্ক সুদর্শন সন্তানের জননী হওয়া; প্রসবাবস্থায় যেরূপ কামনা করা যায় তদনুরূপ সন্তান জন্মলাভ করে এই বিশ্বাসও জননীদের মধ্যে ছিল। শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে সুবর্ণচন্দ্রের নামকরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ইঙ্গিত আছে। প্রসূতির স্বাভাবিক প্রবণতানুযায়ী সুবর্ণচন্দ্রের মাতার ইচ্ছা হইয়াছিল শুক্লপক্ষে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ ব্যাসরেখা দেখিবার; তাঁহার সে-ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় তিনি সোনার মত উজ্জ্বল অর্থাৎ সুবর্ণময় একটি চন্দ্র (অর্থাৎ সুবর্ণচন্দ্ররূপ পুত্র) দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে এ-বিশ্বাস আজও সক্রিয় যে, শুক্লপক্ষের গোড়ার দিকে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ গোলকরেখা প্রত্যক্ষ করিলে প্রসূতি চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ সুন্দর সন্তান প্রসব করেন।

সংক্রান্তি ও একাদশী তিথিতে এবং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণে তীর্থস্নান উপবাস এবং দানে অনেক নারীই অভ্যস্তা ছিলেন; রাজান্তঃপুরিকারাও এইরূপ করিতেন। স্বামী ও স্ত্রী একই সঙ্গে দানধ্যান করিতেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়; স্ত্রী ও মাতারা একক অনেক মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, দানধ্যান করিতেছেন এ-রকম সাক্ষ্যও সুপ্রচুর। রামায়ণ-মহাভারতের কথা প্রাচীন বাংলায় সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত ছিল, এমনকি নারীদের মধ্যেও। মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকাদেবী বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত আনুপূর্বিক পাঠ ও ব্যাখ্যা করাইয়া শুনিয়াছিলেন এবং নীতিপাঠক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ মদনপাল কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন।

নারীরা বোধ হয় কখনও কখনও সম্পন্ন অভিজাত গৃহে শিশুধাত্রীর কাজও করিতেন। তৃতীয় গোপালদেব শৈশবে ধাত্রীর ক্রোড়ে শুইয়া-খেলিয়া মানুষ হইয়াছিলেন, মদনপালের মনহলি-লিপিতে এইরকম একটু ইঙ্গিত আছে। জীমূত-বাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, নারীরা প্রয়োজন হইলে সূতা কাটিয়া তাঁত বুনিয়া অথবা অন্য কোনো শিল্পকর্ম করিয়া স্বামীদের উপার্জনে সাহায্য করিতেন; কখনো কখনো অর্থলোভে প্ররোচিতা হইয়া

স্ত্রীরা স্বামীদের শ্রমিকের কাজ করিতে পাঠাইতেন; এ-ব্যাপারে স্ত্রীরা নিয়োগ-কর্তাদের নিকট হইতে উৎকোচগ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

একটিমাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সমাজের সাধারণ নিয়ম; সাধারণ লোকেরা তাহাই করিতেন। তবে, রাজরাজড়া সামন্ত-মহাসামন্তদের মধ্যে, অভিজাত সমাজে, সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না, এবং সপত্নীবিদ্বেষও অজ্ঞাত ছিল না। দেবপালের মুঙ্গের-লিপিতে, মহীপালের বাণগড়-লিপিতে সপত্নী বিদ্বেষের ইঙ্গিত আছে; আবার কোনো কোনো লিপিতে (ঘোষরাবা-লিপি) স্বামী সমভাবে সকল স্ত্রীকেই ভালোবাসিতেছেন, সে-ইঙ্গিতও আছে। প্রাচীন বাংলার লিপিমালায় বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর; তবে একপত্নীত্বই যে সুখী পরিবারের আদর্শ তাহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে।

প্রাচীন বাংলায়ও বৈধব্যজীবন নারীজীবনের চরম অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রথমেই ঘুচিয়া যাইত সীমন্তের সিঁদুর, এবং সঙ্গেসঙ্গে তাহার সমস্ত প্রসাধন-অলংকার, সমস্ত সুখ-সম্ভোগ পড়িত খসিয়া। সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যত্র যেমন, প্রাচীন বাংলায়ও তেমনই কন্যা বা স্ত্রী হিসাবে ছাড়া নারীদের ধনসম্পত্তিতে কোনো বিধিবিধানগত ব্যক্তিগত অধিকার বা সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু স্মৃতিকার জীমূতবাহন বিধান দিতেছেন, স্বামীর অবর্তমানে অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারের দাবি করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন অন্যান্য স্মৃতিকারদের বিরুদ্ধ মতামত সব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বিধান দিতেছেন যে, বিধবা স্ত্রী শুধু খোরাকপোষাকের দাবি ছাড়া আর-কিছু করিতে পারেন না, কিংবা মৃত স্বামীর ভ্রাতা এবং নিকট-আত্মীয়বর্গের দাবি বিধবা স্ত্রীর দাবি অপেক্ষা অধিকতর বিধি-সংগত তাঁহাদের বিধান সজোরে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গেসঙ্গে তিনি অবশ্য একথা বলিয়াছেন, সম্পত্তি বিক্রয় বন্ধক বা দানে বিধবার কোনো অধিকার নাই, এবং তিনি যদি যথার্থ বৈধব্যজীবনযাপন করেন তবেই স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। বিধবাকে মৃত্যুপর্যন্ত স্বামীগৃহে স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাস করিতে হইবে, প্রসাধন-অলংকার-বিলাস-বিহীন সংযত জীবন যাপন করিতে হইবে, এবং স্বামীর পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে যেসব ক্রিয়াকর্মানুষ্ঠানের বিধান আছে তাহা পালন করিতে হইবে। স্বামীগৃহে যদি কোনো পুরুষ-আত্মীয় না থাকেন তাহা হইলে মৃত্যুপর্যন্ত তাঁহাকে পিতৃগৃহে আসিয়া বাস করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থের মতে বিধবাদের মৎস্য মাংস প্রভৃতি যে-কোনো রূপ উত্তেজক পদার্থ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; বৃহদ্ধর্মপুরাণের বিধানও তাহাই। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গলসূচক বলিয়া তখনও পরিগণিত হইত, এবং তাঁহারা সাধারণত উৎসব ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইবার জন্য তখনও ব্রাহ্মণ্য-

সমাজ বিধবাদের উৎসাহিত করিতেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হইয়াছে, 'যে-স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান তিনি স্বামীকে গুরু পাপ হইতে উদ্ধার করেন। নারীর পক্ষে ইহার চেয়ে সাহস ও বীরত্বের কাজ আর কিছু নাই; এই সহমরণের ফলেই স্ত্রী স্বর্গে গিয়া পূর্ণ এক মন্বন্তর স্বামীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারেন। স্বামীর মৃত্যুর বহু পরেও একান্ত স্বামীগতচিত্ত হইয়া স্বামীর কোনো প্রিয় বস্তুর সঙ্গে এক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে বিধবা আত্মাহুতি দিতে পারেন, তিনিও পূর্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হন।' বৃহদ্ধর্মপুরাণের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, সতীদাহ ও সহমরণ-প্রথা প্রাচীন বাংলায়, অন্তত আদিপর্বের শেষ দিকে, অজ্ঞাত ছিল না।

নারীদের শুচিতা ও সতীত্বের আদর্শ স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই প্রচার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাহাই ছিল, এ-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ কম। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, বিত্তবান্ নাগর-সমাজে তাহার ব্যতিক্রমও কম ছিল না। আর, পল্লীসমাজের যে-স্তরে ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ পুরাপুরি স্বীকৃত ছিল না, আদিম কৌমগত সামাজিক আদর্শ ছিল বলবত্তর, সে-স্তরে যৌনজীবনের আদর্শই ছিল অন্য মাপের, রীতিনীতিও ছিল অন্যতর। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-সমাজাদর্শদ্বারা তাহার বিচার চলিতে পারে না। হাড়ি ডোম নিষাদ শবর পুলিন্দ চণ্ডাল প্রভৃতিদের বিবাহ ও যৌনজীবনের রীতিনীতি ও আদর্শ কি ছিল, তাহা জানিতে হইলে আজিকার সাঁওতাল কোল হো মুণ্ডা প্রভৃতির ভিতর তাহা খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্য-আদর্শদ্বারা শাসিত সমাজেও বলপূর্বক ধর্ষিতা নারী তখনকার দিনেও সমাজে পতিত বা সমাজচ্যুত বলিয়া গণ্য হইতেন না; বিধিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত-অনুষ্ঠানেই তাঁহার শুদ্ধি হইয়া যাইত—এ-সাক্ষ্য আমরা পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে বিধবাবিবাহও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের নারীরা লেখাপড়া শিখিতেন বলিয়া মনে হয়; পবনদূত-কাব্যে নারীদের প্রেমপত্র-রচনার ইঙ্গিত আছে। নানা কলাবিদ্যায় নিপুণতাও তাঁহাদের অর্জন করিতে হইত, বিশেষভাবে নৃত্যগীতে। নট গাঙ্গো বা গাঙ্গোকের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা সম্বন্ধে সেক-শুভোদয়ায় যে সুন্দর গল্পটি আছে তাহাই এই উক্তির সাক্ষ্য। জয়দেবপত্নী পদ্মাবতীও নৃত্যগীতে সুদক্ষা ছিলেন।

বাৎস্যায়নের সাক্ষ্যে মনে হয়, প্রাচীন বাংলার রাজান্তঃপুরের মেয়েরা স্বাধীন-ভাবে চলাফেরায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন না; পর্দার আড়াল হইতে তাঁহারা অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন। অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনময়ীর জীবনই সমাজের উচ্চকোটি স্তরে সাধারণ নিয়ম ছিল বলিয়া মনে করিবার হেতু বিদ্যমান। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-লিপিতে রাজান্তঃপুরের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কেশব-সেনের ইদিলপুর-লিপিতে আছে, বল্লালসেন তাঁহার বিজিত শত্রুর রাজলক্ষ্মীকে

জয় করিয়া আনিয়াছিলেন পালকিতে বহন করিয়া। মনে হয়, সম্ভ্রান্ত মহিলারা পথে-ঘাটে যাতায়াতকালে পথযাত্রীদের দৃষ্টি হইতে নিজেদেরে আড়াল করিয়াই চলিতেন। কেশবসেন সুপুরুষ ছিলেন; তাঁহার ইদিলপুর-লিপিতে দেখিতেছি, তিনি যখন রাজপথে বাহির হইতেন, পৌরসীমন্তিনীরা সৌধশিখরে উঠিয়া তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিতেন। কিন্তু, পবনদূতে বিজয়পুরের মহিলাদের যে-বর্ণনা পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের অবগুণ্ঠনের বালাই খুব বেশি ছিল না। সম্ভ্রান্ত স্তরে যাহাই হউক, সমাজের যে-স্তরে নারীদের হাটে-মাঠে-ঘাটে খাটিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে হইত, নানা কাজে-কর্মে শারীরিক শ্রম করিতে হইত তাঁহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠিত জীবনযাপনের কোনো সুযোগই ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না, সে-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল না। মধ্যবিত্ত কুলমহিলারা অবগুণ্ঠন দিতেন; বস্তুত, অবগুণ্ঠন ছিল তাঁহাদের কুলমর্যাদা জ্ঞাপনের অন্যতম অভিজ্ঞান। এই মধ্যবিত্ত কুলমহিলাদের জীবনচর্যার একটি সুন্দর ছবি রাখিয়া গিয়াছেন কবি লক্ষ্মীধর—

শিরোযদবগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানতং
গতং চ পরিমন্থরং চরণকোটীলগ্নে দৃশৌ।
বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং
নিজং তদিয়মঙ্গনা বদতি নূনমুচ্চৈঃ কুলম॥

অবগুণ্ঠিত শির স্বতই লজ্জানত, গমন মন্থর, দৃষ্টি পায়ে নিবন্ধ, বাক্য পরিমিত এবং মৃদুমধুর—এইসব দ্বারা এই মহিলা যেন উচ্চস্বরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করিতেছেন।

বাংলার কবি উমাপতিধর বাঙালি নারীর সুন্দর একটি প্রাকৃত অথচ অনন্য-সাধারণ ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, এবং সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ছবিটি উদ্ধার করিয়াই এই আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে। একবসনা পল্লীবাসিনী বাঙালি নারী বনের মধ্যে ঢুকিয়াছেন ফুল আহরণের জন্য; একটু উঁচুতে নাগালের বাহিরে গাছের ডালে ফুল ফুটিয়া আছে; পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহু উপরের দিকে তুলিয়া সুন্দরী ফুল পাড়িতেছেন। সুন্দর অনবদ্য কাব্যময়তায় উমাপতিধর তাহার এইরূপ ছবি আঁকিয়াছেন—

দূরোদঞ্চিত বাহুমূলবিলসচ্চীন প্রকাশ স্তনা—
ভোগব্যয়ত মধ্যলম্বিবসনানির্মুক্ত নাভিহ্রদা।
আকৃষ্টোজ্ঝিত-পুষ্প মঞ্জরিরজঃ পাতাবরুদ্ধেক্ষনা
চিন্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশ্যাঃ পাদাগ্র-দুস্থা তনুঃ॥

—

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

। ১৩৫২ । ৩৭. হিন্দু সংগীত : প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : সুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ । ৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনোষধি : ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯. শিশুর মন : ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী
৬০. প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদবিদ্যা : ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

। ১৩৫৪ । ৬১. ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২. ভারতশিল্পের মূর্তি : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩. বাংলার নদনদী : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪. ভারতের অধ্যাত্মবাদ : ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫. টাকার বাজার : শ্রীঅতুল সুর
৬৬. হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

। ১৩৫৫ । ৬৭. শিক্ষাপ্রকল্প : শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
৬৮. ভারতের রাসায়নিক শিল্প : ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
৬৯. দামোদর পরিকল্পনা : ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০. সাহিত্য-মীমাংসা : শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
৭১. দূরেক্ষণ : শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২. তেল আর ঘি : শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়